যখন তারা কথা বলবে

শিবরাম চক্রবর্তী

দি বুক এমপোরিয়ম লিমিটেড
২২।১ কর্ণওআলিস স্ট্রীট কলিকাতা—৬

চলন্তিকা গ্রন্থমালা

গিরীন্দ্র সিংহ সম্পাদিত—শুধু গল্প ১৲
সুভো ঠাকুরের—পট ও ভূমিকা ১৲
প্রসাদ সিংহ সম্পাদিত—১৩৫৫র গল্প ১৲

উপন্যাস

সুভো ঠাকুরের—'সঙ্গম' ৪৲
শিবরাম চক্রবর্তীর—পাত্র-পাত্রী সংবাদ ৩৲

চলন্তিকা পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক ও দি প্রিন্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সিংহ, ৭০, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯। প্রাপ্তিস্থান—দি বুক এমপোরিঅম লিমিটেড, ২২।১, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—পাঁচ সিকা

কবি বুদ্ধদেব বসু

জয়যুক্তেষু

আধুনিক নাটক

আধুনিক নাটক সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়ায় একটা মস্ত অসুবিধা সেটা হচ্ছে আধুনিক নাটকের অনস্তিত্ব। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হতে আধুনিক কথা-সাহিত্যিক পর্যন্ত উপন্যাস-রচনার একটা সুনির্দিষ্ট অথচ বিভিন্নমুখী ধারার সন্ধান মেলে—তার বৈশিষ্ট্যও যেমন, বৈচিত্র্যও তেমনি। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের বেলায় তেমন-কিছু পাই না। গিরিশচন্দ্রের পরে আর সকলে, একাদিক্রমে ও সমান বিক্রমে তাঁরই কায়দাকানুন মেনে তাঁরই থাড়া-বড়ি-থোড় নানাভাবে ও ভঙ্গীতে চালাতে চেয়েচেন। একটি মাত্র ব্যতিক্রম—রবীন্দ্রনাথ।

এখানে বলে রাখা ভালো, গিরিশচন্দ্র বাংলার গ্যারিক্ হতে পারেন, কিন্তু বাংলার শেক্‌স্‌পীয়ার তিনি নন্। এই কারণে রঙ্গমঞ্চের তাগিদে যেসব নাটক তিনি রচনা করেচেন, তা অভিনয় ও নাট্যশালার যেমন খোরাক যুগিয়েচে তেমনি পঙ্গু করে গেছে আমাদের নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। নাট্যসাহিত্য রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী হওয়ায় এই হয়েচে যে নাট্যপ্রতিভা স্বাধীনভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে পারেনি—তাই আমাদের নাটকের মধ্যে না দেখি কৌলিকতা না কোনো মৌলিকতা।

ওদেশে শেক্‌স্‌পীয়ারের পরে দেখা যায়, ইব্‌সেন্, মেটারলিঙ্ক্, বার্ণার্ড শ', বেনাভেঁতে ও গল্‌সোয়ার্দিকে—

কিন্তু এখানে গিরিশচন্দ্রের পরে, এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, দ্বিতীয় কোনো নাট্যরথীর সন্ধান মেলে না—যাঁর রচনা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—এই এক নতুন দিক্‌স্তম্ভ।

বিংশ শতাব্দীর কোনো এক দশকে জন্মগ্রহণ করেচে—কেবল মাত্র এই দাবীর জোরে একটা নাটককে আধুনিক বলা যায় না। আধুনিক নাটকের অন্তত দুটি লক্ষণ থাকা চাই। প্রথম, তার নাট্যরূপে বিশিষ্ট নতুনত্ব; দ্বিতীয়, তার নাট্য-রসে আজকের জীবন-সমস্যা। এ দুয়ের একটি মাত্র থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ আধুনিক নাটক বলা মুস্কিল।

প্রথমে নাট্য-রূপের কথাই ধরা যাক্। কী বলা হোলো আর্টের দিক থেকে সেটা ততো উল্লেখ্য নয়, যতটা কেমন করে বলা হোলো—সেইটে। বিষয়বস্তুর চেয়ে তার রূপ-রচনা বড়ো।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের আপেক্ষিকে বার্ণার্ড শ' বা গল্‌সোয়ার্দির নাটকের বিষয়-বস্তু ও রচনারীতির পার্থক্য যথেষ্টই,—কিন্তু তাঁদের রচনায় রূপের তফাৎটাই বেশি। শেক্‌স্‌পীয়ারের অনুকরণে গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনা করেন বহু অঙ্ক ও প্রত্যঙ্কে দৃশ্যবিভাগ করে'; কিন্তু ইব্‌সেন্ করেন নাট্যরূপের নতুন আমদানি। তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য অনেক-কিছু;—কিন্তু যেটা সব প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে তিনটি বা চারটি দৃশ্যে নাটকের সম্পূর্ণতা।

ইব্‌সেনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য, তাঁর নাটকে স্থান, কাল ও ঘটনার অপূর্ব সঙ্গতি—একই স্থানে, একই বর্তমানে—প্রায়ই দু'তিন দিনের মধ্যে, নাটকের সম্পূর্ণ ঘটনাটা ঘটে থাকে। আমাদের নাটকের এ-সব বালাই নেই। 'ভীষ্মে' আমরা দেখি, নায়িকার দু-দুটো জন্ম নিয়ে নাট্যলীলা

চললো, যিনি নায়ক তিনি কিশোররূপে অভিনয় করতে ষ্টেজে নেমে দেখতে দেখতে বুড়িয়ে গেলেন—কিন্তু নাট্য-স্রোতে কোনো বাধা-বিপত্তি ঘটলো না। 'চন্দ্রগুপ্তে' দেখি এ্যান্টিগোনাস্ এই গ্রীসে তাঁর মাতৃ-সন্নিধানে, মূর্তিমান প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা! ('বলো নারি, আমার পিতা কে?') আর এই তাঁকে দেখি ভারতবর্ষে। আমাদের দর্শকের নির্বিকার ও নির্বিচার উপভোগ-শক্তির প্রশংসা করতে হয়!

বস্তুতপক্ষে, মানুষের জীবনে নাটকের টুক্‌রো-টাক্‌রো এইরকম খাপ-ছাড়া ভাবে কখনই ঘটেনা যে সেই সব টুকরোগুলোকে একসাথে টেঁকে দিলেই নাটকে দাঁড়াবে। এভাবে জীবনে যা ঘটে, তা হচ্ছে উপন্যাস,—এবং তা নিয়ে যা লেখা চলে তাও উপন্যাস। মানুষের জীবনে উপন্যাস হচ্ছে জোড়াতালি কিন্তু নাটক আসে ঘূর্ণির মতো; বেশিক্ষণ স্থিতি তার পক্ষে স্বাভাবিক নিয়ম না,—এই অল্প সময়ের মধ্যে সে কতকগুলো জীবনে একটা ওলোট পালোট ঘটিয়ে ছ্যায়—সেই ঘূর্ণির তোড়ে কেউ ছিট্‌কে আসে, কেউ ছট্‌কে বেরিয়ে যায়—এই নিয়েই জীবনের নাটক—কমেডি ও ট্রাজেডি।

কেউ হয়তো বলবেন, সামাজিক নাটকে এটা চলতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের বেলায় সময় স্থান ও ঘটনার ঐক্য কি করে সম্ভব? যেখানে কতকগুলো ঘটনা বহুপূর্বে ঘটে গেছে এবং যে-তথ্যগুলো এই নাটকীয় ঘটনার মূলীভূত কারণ, সেখানে নাট্যরচনায় সেগুলি না ঘটিয়ে এড়িয়ে যাবার যো কই?

এর জবাবে, ইব্‌সেনের পদ্ধতির দিকে আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ইব্‌সেনের Warriors of

Helgeland ঐতিহাসিক নাটক, এবং তারও কতকগুলো ঘটনা নাটক শুরু হবার বহুপূর্বে ঘটা, যে ঘটনাগুলো এই নাটকের গতি ও সমাপ্তিকে প্রভাবিত করে রয়েছে ;—অথচ ইব্‌সেন্ সেই ঘটনাগুলোকে প্রস্তাবনা-অঙ্ক হিসেবে পুনরাবৃত্ত না করে' নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে বিবৃত করিয়েছেন ; তাতে নাটকের গতির হানি হয়নি কিছুমাত্র. অথচ সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বেড়েচে আশ্চর্যরকম।

তবে কথা এই যে, ইব্‌সেনের পদ্ধতিটা সহজ নয়, একে আয়ত্ত করতে হলে শক্তি ও সাধনার সঙ্গে প্রতিভা চাই। তাঁর Wild Duck-এ আমরা কী দেখি?—কতকগুলো লোকের জীবনে আগে একটা নাটক ঘটে গেছে, সেই নাটকটাকেই শেষের দিক থেকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত (unfold) করে' ক্রমে গোড়ার দিকে আসা হোলো—তার ফলে ঘটে গেল আরেকটা নাটক। খাঁটি উপন্যাস লেখা খুবই শক্ত, কিন্তু এই ধরণের খাঁটি নাটক লেখা তার চেয়েও বুঝি শক্ত।

অবশ্য এখানে কেবলমাত্র ইব্‌সেনের পদ্ধতির ইঙ্গিত করে একথা আমি বলতে চাইনে যে. তাঁরই অনুকরণে আধুনিক নাট্যকারকে কলম ধরতে হবে। কেননা শেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্য-রীতির ধারণায় লিখলে যেমন তাঁর রচনাকে আধুনিক নাটক বলবো না, তেমনি ইব্‌সেনের নাট্যরূপ ধার নিলেও না। তাঁকে তাঁর নিজের ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ নতুন রূপের উদ্ভাবনা করতে হবে, এবং তাঁর সেই অন্তরের পরিকল্পনাকে প্রমূর্ত করতে হবে দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক সাধনায়। তাঁর সম্মুখে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর এই প্রশ্নটি জেগে থাকবে সর্বদাই,—হে রূপকার, কোন্ নতুন রূপটি তুমি সর্বকালের জন্য সৃষ্টি করলে?

কিন্তু কেবল রূপই তো সব নয়, রূপের পাত্রে তিনি কী অপরূপ পরিবেশন করবেন সেটাও একটা বড় কথা।

ইংরেজিতে drama ও play বলে' দুটো শব্দ আছে —এই দুই অর্থেই আমরা 'নাটক' কথাটিকে প্রয়োগ করে থাকি। Drama হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ-নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যার রচনা—যে বই অভিনয়ের যোগ্যতা রঙ্গমঞ্চকে অর্জন করতে হবে; আর play হচ্ছে তাই যাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের যোগ্য করে লেখা হয়েচে। play-বই-এ অভিনেতাদের সুবিধার জন্য মাপসই ভূমিকা বসাতে হয়; আর দর্শকদের খুশির জন্য তাক্‌মাফিক দিতে হয় প্রস্তাবনা, নৃত্য-গীত, ডুয়েট্, গাজনের সং, সঙ্গীত-সংগ্রাম, ম্যাড্‌সিন্, ডাইং স্পীচ্—উজ্জ্বল দৃশ্য ইত্যাদি। এককথায় প্লে-বই কাটে হাততালিতে; আর ড্রামা বই কাটে পোকায়। উদাহরণতঃ বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের র ক্ত ক র বী· মু ক্ত ধা রা প্রভৃতি বই এখনো ষ্টেজসই হয়নি।

সুতরাং বাছাই করতে গেলে দেখতে পাবো, নাট্য-সাহিত্যে ড্রামা দু-চারটি মাত্র, প্লে-ই সব। 'প্রফুল্ল' নাটকে আমরা কী দেখি? যে-মা আর-সব ছেলের মুখ চেয়ে পুত্রশোক পর্যন্ত হজম করেন, তিনি ছেলের দু-চার দিনের জেলের ঠেলায় কী বিচিত্র পাগলামিই-না শুরু করলেন! 'দৃশ্য'-তৈরি করে অভিনয় জমানোর জন্যেই এই অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েচে।—আধুনিক নাটকে এ-সবের আশ্রয় নেই। শরৎচন্দ্রের 'রমা'-ও ঠিক এইরকম দর্শকের-মুখ-তাকিয়ে বানানো,—ফলে বইখানি drama হতে পারেনি, হাততালি-দৃশ্যে বোঝাই চলনসই play হয়েছে মাত্র।

আধুনিক নাট্যকারকে এই স্থলভ যশের সনাতন পথ বর্জন করে নিজের জন্ম নতুন পথ কেটে নিতে হবে। নাট্য-রূপের দিক দিয়ে যেমন তিনি আনবেন নতুন-কিছু, নাট্য-রসের উদ্বোধনের দিকেও তেমনি থাকবে তাঁর অপূর্ব-কিছু।

আধুনিক ঔপন্যাসিক, মানুষের জীবনে 'উপন্যাসকে' যে-রকম ঘটতে দেখেন সেই ভাবেই তাকে চিত্রিত করেন। আধুনিক নাট্যকারেরও উচিত হবে, মানুষের জীবনে 'নাটক' যে-রকমটা ঘটে থাকে, ঠিক-তাকেই তাঁর নাটকে স্বাভাবিক প্রতিরূপে ফলিত করা। আর্ট ফোটোগ্রাফি নয়—একথা সত্য এবং অনেকে বলে থাকেন; কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, ফোটোগ্রাফিও আর্টে পরিণত হতে পারে আর্টিস্টের দৃষ্টি-নৈপুণ্যে ও সৃষ্টি-কৌশলে। সিনেমা-ফিল্‌ম তো আগাগোড়া ফোটোগ্রাফি ছাড়া কিছুই না, কিন্তু তা আর্ট নয়, এ কথা আজ কে বলবে?

নাট্য-রচনায় প্রথমে রূপের কথা। তিন-চার ডজন দৃশ্য না থাকলে এদেশে নাটক তৈরি হয় না, সেখানে আধুনিক নাটক একটিমাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ হবে। এই নাটকের অভিনয়ে সময় লাগবে না বেশি এবং এর-মধ্যে নাচ-গানের অনাবশ্যক বাহুল্য থাকবে না আদপেই। স্থান-কাল-ঘটনার সঙ্গতি এত নিবিড় হবে যে নাট্যোল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ঘটবে না এবং শুরু হবার পরে, একেবারে গিয়ে যবনিকাপাত হবে—মাঝে কোনো সাময়িক বিরতি (interval) অবধি থাকবে না।

তারপরে, রস-সৃষ্টির দিক দিয়ে স্থূলতর ইমোশন্‌কে উত্তেজিত করে রসোদ্বোধন করা কাজ হবে না তার—মানুষের সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে সাড়া জাগানোই হবে মূল

লক্ষ্য। পাত্র-পাত্রীরা বক্তৃতার চেয়ে ইঙ্গিত করবে বেশি, এবং সমাধানের চেয়ে সঙ্কেত হবে বড়ো।......

রঙ্গালয়ের নাটকে প্রায়ই দেখা যায়, একটি বা দুটি চরিত্র আর-সব-চরিত্রের মাথা খেয়ে অসঙ্গত ভাবে বেড়ে উঠেচে—এবং বাকি চরিত্রগুলি সেই দুটি চরিত্রকে ফোটাবার জন্যই যেন আত্ম-সমর্পিত। 'প্রফুল্ল'র যোগেশকে ফোটাবার জন্য বেচারা রমেশ-সুরেশ প্রভৃতির নাজেহাল দেখলে দুঃখ হয়। আত্মোৎসর্গের দিক দিয়ে এটা খুব বড়ো আদর্শ হতে পারে—কিন্তু আধুনিক নাটক-রচনায় এ ধারা চলবে না। এমন ভাবে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে—প্রত্যেককেই নাটকের মুখ্যপাত্র বা পাত্রী বলে মনে হয়,—যেমন দেখি গোর্কির Lower Depths-এ।

আসলে আধুনিক নাটকে চরিত্র-সৃষ্টির কোনো বাড়াবাড়ি থাকবে না—আধুনিক নাট্যকার মানুষের কতকগুলো type না দেখিয়ে, মানুষের LIFEটাকেই বড়ো করে দেখাবেন। এর পর ট্রাজেডি-রচনার সময়, যে-মানুষটি বা যে-দুটি নরনারী ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের ওপরই কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ না করে', যে-কারণে তারা ব্যর্থ হোলো সেই পরিবেশের (situation) ওপরে আলোকপাত করাই অধিকতর নাটকীয় হবে।

'রমা'-নাটকের মধ্যে দৈবক্রমে এই আধুনিক লক্ষণটি রয়ে গেছে। রমা ও রমেশের ব্যর্থতার দিকে গ্রন্থকার তত বেশি জোর না দিয়ে, তারা যে-কারণে ব্যর্থ হোলো সেই পল্লীসমাজের পারিপার্শ্বিক চিত্রটাই বেশি করে ফুটিয়েছেন, —কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রাহসনিক (farcical) রূপ

দেওয়ার চেষ্টা করায় তাঁর ট্রাজেডির উদ্দেশ্যেরই অপঘাত ঘটেছে। এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনা রবীন্দ্রনাথের 'গৃহ-প্রবেশ'। একমাত্র এই বইখানিকেই আমরা 'আধুনিক নাটক' আখ্যা দিতে পারি।

আগে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কতকগুলো situation তৈরি করা হোতো এবং এখনও হয়; কিন্তু এর পরে কেবল situation-টিকেই ফুটিয়ে তোলার জন্যই কতকগুলো চরিত্র সৃষ্টি করা হবে। জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে—নরনারী তার ঢেউ মাত্র; ঢেউকে একান্তভাবে দেখানোর কোনো মানে হয়না, কিছুই সার্থকতা নেই, ঢেউগুলিকে ততখানি ও তেমনিভাবে দেখাতে হবে যাতে তরঙ্গলীলা অতিক্রম করে অখণ্ড জীবনধারার গভীর পরিচয় আমরা পাই। বিচিত্র কোণ থেকে বিচিত্র আলোকপাত করে সেই বিচিত্র আর অদ্ভুত জীবনকেই সম্পূর্ণ ভাবে দেখাতে হবে তার প্রতিদিনের ব্যর্থতা ও সার্থকতার মধ্যে। আর, তাই হবে আধুনিক নাটক। *

* লেখকের 'আজ এবং আগামী কাল' নামক প্রবন্ধের বই থেকে এই লেখাটি উদ্ধৃত। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। (তারপরে প্রকাশিত 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি' নামে লেখকের অপর এক প্রবন্ধগ্রন্থে প্রকাশক-লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

এই নাটকটির সম্পর্কে

এই নাটকটি শিবরামবাবু লেখেন প্রায় দুই যুগ আগে—বয়সের বিশ তখনো তাঁর কাটেনি। প্রথম বেরিয়েছিল নবশক্তি নামক সাপ্তাহিকে—উক্ত অধুনালুপ্ত পত্রিকায় ১ম বর্ষ ৪৫ সংখ্যায়। একদা-বিখ্যাত 'নবশক্তি' ছিল দেশবন্ধু-পরিচালিত স্বরাজ্যদলের অন্যতম মুখপত্র। এখন ওই কাগজের কোনো চিহ্নও কোথাও সহজে চোখে পড়ে না এবং এযুগের পাঠক পাঠিকারা শিবরামবাবুর এই নামকরা লেখাটির সঙ্গে পরিচিত নন্ জেনে আমরা 'চলন্তিকা'য় এটির পুনর্মুদ্রণ করলাম। প্রথম প্রকাশকালে লেখাটি লেখক ও পাঠক মহলে সাড়া তুলেছিল বলে শোনা যায়। এটিকে লেখক যথাযথই রেখেছেন—এর আগের রূপের উপর কোনো রূপ পরিবর্তন বা পরিমার্জনা করেননি।

নাটকটির (এবং লেখকের) পরিচয়সূত্রে নবশক্তি-সম্পাদক (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—এখনকার নামজাদা নাট্যকার) যে কথাগুলি বলেছিলেন সেই ছোট্ট ভূমিকাটির উল্লেখ হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"নাট্যকার 'ভারতী' কাগজে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনা পাওনা' 'ষোড়শী'তে রূপান্তরিত করে তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন; তাঁর 'চাকার নিচে' সাহিত্য-রসিকদের প্রীত করেছে এবং বাঙলা নাট্যসাহিত্যে তা হয়েছে এক অভিনব দান। তাঁর এই নাটকখানা যাঁরা পড়বেন তাঁরাই দেখতে পাবেন গঠনের দিক দিয়ে এর যেমন একটা নতুন ভঙ্গি আছে তেম্‌নি খাঁটি নাটকত্ব এতে রয়েছে প্রচুর।" (চলন্তিকা, আষাঢ়, :৩৫৬)

এই নাটকের পাত্রপাত্রী

সিদ্ধার্থ	এক অপদার্থ
সোমেশ	তরুণ লেখক
পুণ্য	সোমেশের বন্ধু
জিগা	এক গাঁটকাটা
মঞ্জরী	নার্স

এছাড়া—

এক বুড়ো রুগী,
জনৈক নার্স,
একটা কুলি,
এক পাহারাওয়ালা,
একজন ডাক্তার,
আরেক ডাক্তারসাহেব।

কোনো বেসরকারী হাসপাতালের একাংশ এই নাটকের ঘটনাস্থল। ঘটনাকাল—গান্ধিজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সমসাময়িক।

যখন তারা কথা বলবে

নার্সিং হোম ; তাহারি একটি কক্ষ। চওড়া ঘরে চারটি লোহার খাট ; প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শয্যায় রোগী, কেবল তৃতীয় খাটটি খালি। খাটগুলি পিছনের দেয়াল ঘেঁসিয়া, প্রত্যেক খাটের মাথার দিকে একটি করিয়া প্রশস্ত বাতায়ন—সর্বদাই খোলা ; খাটে বসিয়া একটু উঁচু হইলেই তাহার ভিতর দিয়া নিচের রাস্তার সব কিছু দেখা যায়, খাটের ধারে মেঝেয় দাঁড়াইয়াও দেখা চলে। পাশের ঘরে যাতায়াতের জন্য দুই দিকে দুইটি দরজা।

রাস্তার অপর পাশে জেলখানা—জানালাগুলি দিয়া তাহার সম্মুখভাগের কিছুটা দেখা যাইতেছে ; জেলখানার আড়ালের কোনো ফাঁক দিয়াই আকাশ দেখা যায় না। রাস্তা হইতে মাঝে মাঝে ট্রামের শব্দ, মোটরের হর্ণ কানে আসে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শয্যায় সোমেশ ও সিদ্ধার্থ—দুজনেই যুবক। চতুর্থ শয্যায় দুই চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি বৃদ্ধ রোগী অকাতরে ঘুমাইতেছে। প্রত্যেক রোগীর খাটের কাছে টীপয়, মূত্রাধার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

ডাক্তার, নার্স ও নার্সিং হোমের কুলীরা মাঝে মাঝে এই ঘর দিয়া যাতায়াত করিতেছে। মাঝে মাঝে আশে পাশের ঘর হইতে রোগীর আর্তধ্বনি। আইডিন, আইডোফর্‌ম্ ও কার্বলিক এসিডের গন্ধ।

যখন তারা কথা বলবে

[সম্পূর্ণ নাটকটি এক অঙ্কে ও একটিমাত্র দৃশ্যে রচিত। অভিনয় করিতে হইলে ইহার দৃশ্যবিভাগ বা ইহাতে নাচ গানের বালাই যোগ করা চলিবে না। অভিনয় শুরু হইয়া একেবারে শেষ পটক্ষেপের মাঝে কোনো সাময়িক বিরতি (interval) না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

পাত্র পাত্রীর নাম ও পরিচয় স্বতন্ত্র জানানো অনাবশ্যক, তাহা নাটকের যথাস্থানে আছে। সময়-নির্দেশ সম্বন্ধেও সেই কথা।]

সিদ্ধার্থ। আজ সকাল থেকেই বড্ড ছটফট করচ যে! শরীর খুব খারাপ?

সোমেশ। না না, শরীর কিছু নয়—

সিদ্ধার্থ। কী ভাবচ এত?

সোমেশ। পুণ্য এখনো এলো না কেন?

সিদ্ধার্থ। পুণ্য? এখনো তো তার আসার সময় হয়নি।

সোমেশ। দশটা বাজেনি এখনো? জেলখানার বড় ঘড়িটা একবার দেখনা ভাই।

সিদ্ধার্থ। (জানালাপথে চাহিয়া)। বাজলো বলে'।··· জেলটার চেহারাটা দেখেচ সোমেশ?

সোমেশ। দেখচি। কেন?

সিদ্ধার্থ। আজ যেন ওর মুখখানা কিরকম অন্ধকার, কেমন ভয়াবহ।

সোমেশ। রোজ যেমন আজো তাই।

সিদ্ধার্থ। না, আজ যেন বেশি। গেটের লোহার গরাদগুলো দেখেচ? মনে হচ্ছে যেন রক্তমাখা।

সোমেশ। রক্তমাখা? কি বলচ সিদ্ধার্থ?

সিদ্ধার্থ। ওরই আড়ালে আজ সকালে বিসমিলের ফাঁসি হয়ে গেল।

সোমেশ। ফাঁসি?

সিদ্ধার্থ। তারই রক্ত ওই গরাদের গায়ে লেগে রয়েচে। দেখচ না?

সোমেশ। বিস্‌মিল—সেই বিদ্রোহী? কিন্তু তার ত দশ বছরের জেল হয়েছিল।

সিদ্ধার্থ। জেল ভেঙে পালাবার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাই পুনর্বিচারে ফাঁসি। কাল ডাক্তারবাবুর হাতে যে খবরের কাগজ ছিল তাতেই দেখলাম।

সোমেশ। ওই মোটা মোটা লোহার গরাদ—ওই ভেঙে পালানো কি সোজা? সেকি সম্ভব?

সিদ্ধার্থ। কী হিংস্র, কী কুৎসিৎ ওর মুখ! ওই জেলটার! দুই কষ বেয়ে ওর রক্ত গড়াচ্ছে। ওর খিদের জন্যে প্রত্যেকদিন টাট্‌কা মাংস চাই।

[ক্ষণেকের নীরবতা।]

সোমেশ। (জানালা-পথে চাহিয়া)। ট্রামগুলো এত দূরে বাঁধে যে কে নামে না নামে এখান থেকে দেখাই যায় না।

সিদ্ধার্থ। ব্যস্ত হয়ো না। কাল তো তোমার নাটকের দ্বিতীয় রজনী গেছে? তাই না?

সোমেশ। সে না এলে কিছুই বলতে পারচি নে।

সিদ্ধার্থ। কেন? প্রথম রাত্রে তো বেশ লোক হয়েছিল শুনছিলুম।

সোমেশ। অধিকারী মশাই কিছুতেই আমার নাটক

নিতে রাজি ছিলেন না। বলছিলেন প্রথম রাত্রিই আমার নাটকের শেষ রাত্রি হবে। তা পুণ্য এখনো আসছে না কেন?

সিদ্ধার্থ। নাটকের নাম কি দিয়েচ ভাই?

সোমেশ। ভবিষ্যৎ।

সিদ্ধার্থ। অদ্ভুত নাম তো! গল্পটা কিসের?

সোমেশ। এক ছিল যুবক যে তার ভবিষ্যতকে নিজের মনের মতো করে' গড়তে চেয়েছিল—

সিদ্ধার্থ। বাঃ, এতো আমাদের গল্প—আমাদের প্রত্যেকের! তার পর?

[নীচে গোলমাল শুনিয়া জানালা-পথে চাহিল।]

একি? ব্যাপার কি?

সোমেশ। ট্রামটা। আমাদের বাড়ির সামনেই বাঁধলো যে! কিসের গোলমাল?

সিদ্ধার্থ। একটা লোককে সবাই ধরে মারচে।

সোমেশ। চোর হবে বোধহয়। কি, গাঁটকাটাই!

সিদ্ধার্থ। পুলিস এসে পড়েচে। একি, পুলিসও রুলের গুঁতো চালায় যে!

সোমেশ। যেমন কর্ম তেমনি ফল।

সিদ্ধার্থ। তা তুমি বলতে পারো না। আমি এক পকেটমারকে জানি যার রাজনৈতিক বুদ্ধি কোনো হোম মেম্বারের চেয়ে কম নয়। সুযোগ পেলে সে দেশের নেতাও হতে পারতো!

সোমেশ। বটে? কি করে' পরিচয় হোলো তার সঙ্গে?

সিদ্ধার্থ। সে বেটা আমারি পকেট কেটেছিল।

সোমেশ। বল কি ?

সিদ্ধার্থ। একদিন বড়বাজার দিয়ে আসচি! ছ্যাকরা গাড়ির এক ঘোড়া সর্দি গর্মি হয়ে মাটি নিয়েচে। রাস্তা জাম্—ট্রাম, বাস, মোটর, সব দাঁড়িয়ে। সামনের এক মোটরে এক কিশোরী—যেমন সুঠাম তার দেহ তেমনি সুন্দর তার মুখ! তাকেই একমনে দেখচি, এমন সময়ে পাহারাওয়ালা একটা লোককে পাকড়াও করে এনে আমাকে বলচে, বাবু, এ আপনার পকেট মেরে ভাগছিল।

সোমেশ। তারপর ?

সিদ্ধার্থ। পকেটে হাত দিয়ে দেখি যথার্থই! পয়সা বাঁধা রুমালটির অন্তর্ধান! কিন্তু লোকটার মুখ দেখে বড়ো মায়া হোলো। মনে হোলো সারাদিন কিছু খায়নি। পাহারাওয়ালাকে বল্লুম, আমার পকেটে তো কিছু ছিল না বাপু। আমার পকেট ও মারবে কোত্থেকে—

চোখে-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বৃদ্ধ রোগিটী (রাস্তার গোলমালে জাগিয়া)। আঃ। এত গোল কিসের ? রাত্রেও এরা একটু ঘুমুতে দেবে না ?

সোমেশ। কাল সমস্ত রাত লোকটা আর্তনাদ করেচে। চোখের যন্ত্রণায়।

সিদ্ধার্থ। আজ ডাক্তারসাহেব এলে ওর চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে।

বৃদ্ধ। এখন রাত কত মশাই ?

সোমেশ। রাত কোথায় ? এখন তো—

সিদ্ধার্থ (ঠোঁটে আঙুল দিয়া তাহাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল)। এখনো রাত বেশি হয় নি, এই দশটা

মোটে। আপনি ঘুমোন।...লোকটার কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। সমস্ত রাত জেগে ছটফট করে, ভাবে দিন। আর দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

সোমেশ। আহা, বেচারা!

বৃদ্ধ। তোমাদেরো কি চোখে ঘুম নেই বাপু? খালি গজ গজ। একটু যে চোখের পাতা বুজবো তার যো নেই।

[সিদ্ধার্থ ও সোমেশ চুপ করিয়া রহিল, জেলখানার ঘণ্টায় দশটা বাজিল। রাস্তায় গোলমাল তখন থামিয়াছে।]

বৃদ্ধ। সবে দশটা রাত। আঃ!

[পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।]

সোমেশ। তারপর কি হোলো?

সিদ্ধার্থ। তারপর পাহারাওয়ালাটা তার গলাধাক্কা দিয়ে বললে—যা বেটা, খুব বেঁচে গেলি, বাবু ভদ্দর আদমি, তোকে ছোড়ে দিলে। লেকিন তোকে হামি ফিন পাকড়াবে। যাবি কুথায়?

সোমেশ। আর সেই কিশোরী মেয়েটি?

সিদ্ধার্থ। ততক্ষণে ঘোড়াটার ভবলীলা সাঙ্গ। দড়িদড়া খুলে তাকে একপাশে টেনে আনা হয়েচে। রাঁস্তা পরিষ্কার—মোটরটা যে কোন্ ফাঁকে চলে গেচে টেরও পাইনি। বড়ো দুঃখ থাকল।

সোমেশ। ওরকম তো কতো দেখা দেয় কতই হারায় তার আর দুঃখ কি?

সিদ্ধার্থ। মেয়েটিকে যদি একটা কথাও বলতে পেতুম তাহলে কোনো দুঃখ থাকত না। আমার চোখে তার চোখ পড়ত, তার কণ্ঠস্বর শুনতুম—ব্যাস্!

সোমেশ। কি বলতে তাকে?

সিদ্ধার্থ। যা মনে আসতো। হয়তো বলতুম, কী সুন্দর তুমি। তোমার মত মেয়ে আর দেখিনি। তুমি আমার মনের মত মেয়ে! আরো হয়তো বলতুম, আবার একদিন এমনি আমাদের দেখা হবে।

সোমেশ। তুমিও তাকে চেনো না, সেও তোমাকে না—ঠিকানাও জানো না কেউ কারো—আবার দেখা হোতো কি করে'?

সিদ্ধার্থ। কে জানে। হয়ত হোত, হয়ত হোত না। কিন্তু সে ত খানিকক্ষণ ভাবত যে আশ্চর্য এই লোকটি। কিছুক্ষণ আমার কথা ভাবত সে!

সোমেশ। একটুক্ষণ ভাবত—এক নিমেষের জন্য! তাতে লাভ? একটুখানি ভাবনার মধ্যে পেতে, তাতেই সুখ?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, তাতেই! জীবনে আমিও কত সঙ্গী পাবো, সেও কত পাবে। এক নিমেষের পাওয়াই এই জীবনের পুরোপুরি পাওয়া—আমাদের চিরদিনের পাওয়া।

সোমেশ। কিন্তু এক পলকে যার তৃষ্ণা মেটে না? শুধু চোখের চাওয়ায় যে খুশি নয়?

সিদ্ধার্থ। তার মিটবে চোখের জলে। কিন্তু সে কথা থাক, সেই পকেটকাটার কথাই কই। মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে সেণ্ট্রাল এভিনিউর মোড় অবধি এসেচি, এমন সময়ে দেখি সেই পকেটকাটা। এসে বলে,

বাবু, আপনি আমাকে ফাটক থেকে বাঁচিয়েছেন, আপনার পয়সা আমি নেব না। তবে আমাকে আনা দুই দিন আজই জেল থেকে বেরিয়েছি, সারা দিন কিছু খাইনি, ছাতু কিনব। বলে পয়সা-বাঁধা রুমালটা আমায় ফিরিয়ে দিলে।

সোমেশ। আশ্চর্য!

সিদ্ধার্থ। আমি রুমালটা নিলাম—এক বান্ধবীর উপহার সেটা। পয়সাগুলো ওকে দিয়ে দিলাম। আর বল্লাম—পকেট কেট না একথা তোমাকে বলিনে। কেননা পকেট না কেটেই বা তুমি কি করবে? তুমি দাগী, তোমাকে কেউ কাজ দেবে না, বেঁচে থাকার তোমার পথ কই? সুতরাং পকেট মের, কিন্তু বাপু, সাবধানে।

সোমেশ। চুরি করে বাঁচার চেয়ে ওর মরাই ছিলো ভালো। ওকে মরতে বলতে পারতে।

সিদ্ধার্থ। যেহেতু তারা ছোট লোক? সেই জন্যেই? তাদের মরতে বলতে তুমি পারো—সহজেই পারলে—কিন্তু তারা চুপ করে আছে বলে মনে কোরো না যে বলে নেবার কেবল তোমাদেরই অধিকার। ধরিত্রী তার প্রত্যেক সন্তানের খাদ্য যুগিয়েচে। কিন্তু পেটে যা ধরে তার ঢের বেশি কতকগুলো মানুষ ভাঁড়ারে ধরে রেখেচে—তাই অনেককে অর্ধাহারে অনাহারে থাকতে হয়। কিন্তু বাঁচবার অধিকার তাদেরো। এবং চোরাই মাল ফিরে পাওয়া আর যাই হোক চুরি করা নয়। ওদের কণ্ঠ আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি; ওরা কিছু বলে না; কিন্তু যেদিন তারা কথা বলবে সেদিন এই কথাই তারা বলবে।

সোমেশ (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া)। কিন্তু তুমি যে

তার রাজনীতিক বুদ্ধির কথা বললে তার তো কিছু পরিচয় পেলাম না। বরং তোমার টাকা ফেরৎ দিতে এসে সে তো পলিটিকাল বোকামিরই পরিচয় দিলে।

সিদ্ধার্থ। ও ত তার হৃদয়ের পরিচয়,—তার মাথার পরিচয় পাবার সুযোগ হয়েছিল তার পরে।

সোমেশ। আবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? তাই নাকি? কোথায় আবার?

সিদ্ধার্থ। ঐ জেলেই।

সোমেয়। জেল! তোমার জেল?

সিদ্ধার্থ। একটি মেয়ের জন্য—

সোমেশ। কি করেছিলে, নিয়ে পালিয়েছিলে বুঝি?

সিদ্ধার্থ। বলচি।

[পুণ্য প্রবেশ করিল]

—এই যে পুণ্যবাবু। আসুন আসুন!

সোমেশ। আঃ, তোমার জন্য আমি কখন থেকে অপেক্ষা করচি। খবর কি?

পুণ্য। আমি এসেচি অনেকক্ষণ। একটা পিক্‌পকেটকে যা মারটা মেরেচে। নিচে হোমের আউটডোরে তার ড্রেসিং হচ্ছিল তাই দেখছিলাম।

সোমেশ। আমরা ওপর থেকে দেখেচি—ট্রামে যে ধরা পড়ল সেই লোকটাই ত?

পুণ্য। সেই বটে। ট্রামেই আসছিলুম। শ্রীবিলাস বাবু খুব হুঁসিয়ার, তাঁর পকেট কাটা কি সোজা?

সিদ্ধার্থ। কে শ্রীবিলাস বাবু? আমাদের নার্সিং হোমের পাশেই যে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, তারই ম্যানেজার না?

[পুণ্য মাথা নাড়িল।]

—তিনি যাচ্ছেন ট্রামে ? মানে ?

পুণ্য। কেন তা বুঝলুম না। তাঁর ধূসর রঙের প্রকাণ্ড মোটরটা ব্যাঙ্কের সামনেই খাড়া রয়েছে দেখলুম। অথচ তিনি ট্রামে এলেন। বেটা ট্রামের দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, যেই তিনি নামতে যাবেন, তাঁর পকেট থেকে মনিব্যাগটা তুলে নিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়লো—শ্রীবিলাসবাবুই ধরলেন !

সিদ্ধার্থ। হোয়েন এ থিফ্ মীট্‌স্ এ থিফ্ !

পুণ্য। সবাই মিলে ব্যাটাকে চাঁদা করে' চাঁটাতে লাগল, তারপর. এমন কি, কণ্ডাক্‌টারও এসে হাত লাগালো। কারুকেই আর টিকিট কাটতে হল না। আমারো ছটা পয়সা বেঁচে গেছে।

সিদ্ধার্থ (হাসিয়া)। সাধু! সবাই আপনারা মাস্তুত ভাই—তফাৎ যা কিছু খালি ডিগ্রীর।

সোমেশ। খুব মেরেচে ওকে ?

পুণ্য। তারপর রাস্তার লোক। যারা পাঠশালায় মার খেয়েচে আর মাস্টার হয়ে তার শোধ তুলতে পারেনি তাদের কেউই বাদ দিলনা ! সকলেই এই মহৎ ব্যাপারে যোগ দিয়েছে। শেষকালে পুলিস। পাহারাওয়ালাই মেরেচে সব চেয়ে বেশি—বেটনের বাড়িতে বেচারার মাথা ফাটিয়ে দিয়েচে।

সোমেশ। আহাহা !

সিদ্ধার্থ। আরে এইত নিয়ম, এতে দুঃখ করার কি আছে ? যে সামান্য চুরি করে সে খায় মার, যে বেশি করে সে পায় পূজা ; যে একজনকে খুন করে তার হয় ফাঁসি, যে অসংখ্যকে খুন করে সে লোকপূজ্য—তার মহা

বীরত্বের কাহিনী ইতিহাসে লেখা—কিন্তু সে কথা যাক্,
(পুণ্যকে) সোমেশের নাটকের খবর কি বলুন তো ?

পুণ্য। অভাবিত সাফল্য। প্রথম রাত্রে তেমন লোক হয় নি বটে, কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। কতলোক টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছে।

সিদ্ধার্থ। তাহলে 'ভবিষ্যৎ' উজ্জ্বল, বলতে হবে ?

পুণ্য। নিশ্চয়ই—এ বই একশ রাত চলবে।

সিদ্ধার্থ। কি সোমেশ, কথা বলচ না যে। তোমারই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, আমার নয়।

সোমেশ। আমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখচি ভাই।

পুণ্য। অধিকারী আমাকে বললেন, লোকে যে এ ভাবে বইটাকে নেবে এতটা তিনি আশা করেন নি। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করছিলেন।

সোমেশ। তুমি বললে না কেন যে আমি অসুস্থ হয়ে এখানে রয়েচি। আমার দুঃখ রইল আমার বইয়ের প্রথম অভিনয় রাত্রে দর্শকের মধ্যে আমিই পড়লুম বাদ।

পুণ্য। তোমার অসুখের কথা আমি বলেছি। তিনি আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

সোমেশ! আমার সঙ্গে ?···তিনি ?···এখানে ?··· কখন—কখন আসবেন ?

পুণ্য। দুপুরের দিকে। তোমার সঙ্গে রয়্যাল্‌টির কথা কইতেই বোধ হয়।

সোমেশ। রয়্যাল্‌টি! টাকা!···একথা যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, পুণ্য!

পুণ্য। তুমি অমন উত্তেজিত হোয়ো না—ডাক্তার বারণ করেছেন। তোমার অসুখ তাহলে বাড়বে।

সোমেশ। অসুখ! অসুখ যাও আমার ছিল সেরে গেল। এরা আমাকে ছেড়ে দেয় না আজ? আমি তো বেশ ভাল হয়ে গেছি এখন!

পুণ্য। আচ্ছা, আমি ডাক্তারকে বলব। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, অমন উত্তেজিত হয়ো না।

সোমেশ। ভবিষ্যৎ! আমার ভবিষ্যৎ! সত্যি—সত্যি সিদ্ধার্থ, আজ আমার সত্যিই বিশ্বাস হোল মানুষের ভবিষ্যৎ তার নিজের হাতে। মানুষের অসীম শক্তি—অপরাজেয় ক্ষমতা—সে নিজের জীবনকে তার ইচ্ছামত গড়তে পারে।

সিদ্ধার্থ। সব ক্ষেত্রে পারে না ভাই।

সোমেশ। মানুষ পারে না—একথা আমি আর কিছুতেই মানতে রাজি নই, কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারি না। অন্ততঃ আজ ত পারছি না। সব মানুষই পারে। দুর্জয় তার ইচ্ছাশক্তি—দৈবও তার কাছে ঘাড় নোয়ায়।

সিদ্ধার্থ। সব সময়ে নয়।

সোমেশ। তোমাদের ভুল। যে মানুষ পায় না বুঝতে হবে তার আকাঙ্ক্ষা তীব্র নয়, যে মানুষ হারায় বুঝতে হবে তার মুষ্টি শিথিল। এক কালে আমিও তাই ভাবতাম, ভাবতাম মানুষের সব চেষ্টাই নিষ্ফল, ব্যর্থ হতে বাধ্য, আর ব্যর্থতাতেই তার গৌরব—কিন্তু আজ আর সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। জীবনের সঙ্গে যে যুদ্ধ করচে জয় তার হবেই—সার্থকতা তার অনিবার্য—কেবল পরাজয় তার, জীবনের কাছে যে আত্মসমর্পণ করেচে।

সিদ্ধার্থ। জীবন চলে তার নিজের চালে—কেউ তার মুখ ঘোরাতে পারে না।

সোমেশ। 'আজ আমার কী আনন্দ পুণ্য! বহু দিনের বহু দুঃখের মোচন হোল আজ। জান, কতদিন এক পয়সার ছাতু খেয়ে আমি কাটিয়েছি, কতদিন ট্রামের তলায় পড়ে আত্মহত্যার লোভ হয়েচে আমার। কিন্তু আজ আমি জয়ী, আজ—

সিদ্ধার্থ। আজ ভাগ্য তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, ভাগ্য তোমার বন্ধু। আজ পৃথিবী তোমার বন্ধু, এমন কি, বিধাতাও তোমার বন্ধু।

সোমেশ। বিধাতা! বিধাতাকে আমার নমস্কার!

সিদ্ধার্থ। ওই কার্যটি কোরো না। আর যাই করো! তাহলে বিধাতা এক্ষুনি তোমায় পেয়ে বসবে। আবার ঘোঁট পাকাবে, পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেবে, সর্বনাশ করবে—

পুণ্য। অসম্ভব। লোকে নিয়েছে,—সোমেশের নাটক তাদের ভাল লেগেচে। অধিকারী স্বয়ং আসচেন।

সিদ্ধার্থ। কে বলতে পারে? হয়ত ইলেক্ট্রিক ফিউজ হয়ে আজই থিয়েটারে আগুন লেগে যাবে, এমনত কতই লাগে! দৈবের চক্রান্ত কেউ বলতে পারে? সোমেশ, তুমি বিধাতাকে চেন না। আর তুমি কিইবা চেন!

সোমেশ। চুপ কর, চুপ কর। অমন কথা বোল না। বিধাতা মঙ্গলময়, তাঁকে আমার প্রণাম।

পুণ্য। (জানালার কাছে গিয়া) তোমার নাটকের প্লাকার্ড মেরে গেছে দেখেচ?

সোমেশ। কই, কই? কোথায়?

পুণ্য। ঐ যে—জেলের দেওয়ালে। ওই যে বড় বড় অক্ষরে—"ভবিষ্যৎ—মহাসমারোহে দ্বিতীয় অভিনয় রজনী"।

সোমেশ। কিন্তু কই, প্লাকার্ডে আমার নাম কই? নাম তো নেই। আমার নাম নেই কেন?

সিদ্ধার্থ। নতুন লেখকের বই জানলে পাছে লোকে না নেয় তাই প্রথমে নামটা চেপে গেছে হয়ত। ব্যবসার খাতিরে গোপন করতে হয়। এসব ব্যবসাদারি চাল! এইবার যখন বইটার নাম হয়েছে তখন লেখকের নামও এবার দেবে।

সোমেশ। তাই হবে বোধহয়। পুণ্য, রাস্তা দিয়ে খবর কাগজওয়ালা যাচ্ছে, একটা কাগজ নিয়ে এস না ভাই।

পুণ্য। আজকের সমস্ত কাগজ আমি কিনেচি। আনতে ভুলে গেলাম। সমস্ত কাগজে তোমার নাটকের উচ্চ প্রশংসা। একবাক্যে উচ্ছ্বসিত।

সোমেশ। (ব্যগ্র হইয়া)। কি বলেচে তারা, কি বলেচে?

পুণ্য।. সকলেরই এক কথা—এমন নাটক হয় নি হবে না। অভিনয়েরও তারা প্রশংসা করেচে, বলেচে, অপূর্ব নাটকের উপযুক্ত অভিনয়। সকলেই নাট্যকারের নাম জানতে চেয়েচে।

সোমেশ। কেন তারা প্লাকার্ডে আমার নাম দিলো না!

সিদ্ধার্থ। এইবার যখন দেবে তোমার নাম একশগুণ ছড়িয়ে পড়বে। নামটা চেপে গিয়ে কি ভালই করেনি?

পুণ্য। একটা কাগজ প্রশ্ন করেচে, অধিকারী নিজেই তো এর লেখক নন? আরেকটা কাগজ সেই বিখ্যাত ঔপন্যাসিককে এর নাট্যকার বলে' সন্দেহ করেচে। যিনি

তাঁর উপন্যাসগুলোকে অপরের দ্বারা নাটকে পরিবর্তিত করে নিজের নামে চালিয়ে থাকেন!

সিদ্ধার্থ। ঔপন্যাসিক নাট্যকার! হাতীর ঘোড় দৌড়!

[ডাক্তার, নার্স, ও নার্সিংহোমের কুলীর প্রবেশ]

ডাক্তার। এই যে পুণ্যবাবু। আপনার বন্ধুকে দেখচেন কেমন? পৃথিবীতে দুটি ক্রনিক ব্যাধি আছে মশাই, ডাক্তারেরা যেখানে হোপলেস। তা হচ্ছে, সাহিত্য আর প্রেম।

সোমেশ। কিন্তু আরেকটিও আছে ডাক্তার বাবু। দারিদ্র্য।

ডাক্তার। তা যদি বলেন তাহলে জীবন ইটসেল্‌ফ্ একটা ক্রনিক রোগ—মৃত্যুতে যার আরাম। কিন্তু সে কথা থাক সোমেশবাবু, জামাটা খুলুন তো। দেখি বুকটা।

[সোমেশকে পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফল রিপোর্ট-শিট-এ লিখিতে লাগিলেন। প্রত্যেক রোগীরই শিয়রের দিকের দেয়ালে রিপোর্ট-শিট্ ঝুলিতেছে।]

সোমেশ। ডাক্তারবাবু, আজকের খবরের কাগজখানা কি এনেছেন?

ডাক্তার। পাশে আমার ভিজিটিং-রুমে দেখুনতো, আজকের দৈনিকখানা দিয়ে গেছে বোধকরি।

সোমেশ। আমার নাটকের সমালোচনাটা দেখব কেবল।

[পাশের কক্ষে গেল।]

পুণ্য। কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। বেশ ভালোই। অনেকটা ভাল আজ।

পুণ্য। প্রায় সাত দিন হয়ে গেল।

ডাক্তার। কিন্তু ভয় এখনো কাটে নি।

পুণ্য। কিরকম ভয় আশঙ্কা করচেন?

ডাক্তার। বুক এখনো দুর্বল, মানসিক উত্তেজনা বা আঘাত সহ্য করবার শক্তি এখনো ওঁর হয় নি।

পুণ্য। ডাক্তার বাবু, কদিন থেকে আপনাকে জিজ্ঞেস করব করব ভাবচি। রাস্তায় ওরকম হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়বার কারণ আপনার কি মনে হয়?

ডাক্তার। কারণ বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, এক কথায় প্রলঙ্‌ড্ ষ্টার্‌ভেশন্!

সিদ্ধার্থ। ষ্টারভেশন্!

[ক্ষণেকের নীরবতা।]

পুণ্য। আমার বন্ধু সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিক মাত্রই দরিদ্র একথা জানি—কিন্তু তা যে এতখানি তা তো কোনদিন কল্পনা করি নি।

সিদ্ধার্থ। যারা আমাদের আনন্দ যোগায় তাদের আমরা খাদ্যও যোগাতে পারিনে!

[ক্ষণেকের নীরবতা।]

পুণ্য। ও তো অনেকটা সেরেচে এখন। ওকে আমি এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই—আমার নিজের কাছে রাখবো। নিয়ে যেতে পারি?—যাবে ও আজ?

ডাক্তার। আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব এলে তাঁকে বলব, যদি ছাড়তে তাঁর আপত্তি না থাকে, খানিকবাদে এসে নিয়ে যাবেন আপনার বন্ধুকে।

পুণ্য। ধন্যবাদ ডাক্তার বাবু! খবরটা ওকে আমি দিয়ে যাই। নিয়ে যাবার আয়োজন করি গে। নমস্কার।

[প্রস্থান।]

ডাক্তার। দেখি সিদ্ধার্থবাবু, আপনার বুকটা। আরেকটা বোতাম খুলুন। হ্যাঁ হয়েছে, জোরে নিশ্বাস নিন। কাল কি আবার প্যাল্‌পিটেশ্যন্‌ হয়েছিল?

সিদ্ধার্থ। কাল? হ্যাঁ, হয়েছিল বই কি।

ডাক্তার। কখন? রাত্রে?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, রাত্রেই তো।

ডাক্তার। রাত্রের খাবার কতক্ষণ পরে?

সিদ্ধার্থ। তা—ঘণ্টা দুয়েক হবে।

ডাক্তার। দেখুন সিদ্ধার্থবাবু, পরীক্ষা করে আপনার বুকে তো কোনো দোষ পাচ্ছিনে। আমার মনে হয় এটা আপনার হজমের গোলমালে হচ্চে। খাবারের ধরাকাট করলেই সেরে যাবে।

সিদ্ধার্থ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না ডাক্তারবাবু, দেখচি কিছু না খেলেও তো এমনটা হয়ে থাকে।

ডাক্তার। তাই নাকি? খুব আশ্চর্য তো! আচ্ছা, আজ ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা প্রেসক্রুপ্‌সন্‌ করে দেব, সেইটা বাড়িতে চালাবেন। এখানে আর কতদিন এভাবে আটকে থাকবেন? আপনার অসুবিধেও হচ্ছে।

[রিপোর্ট-শিট-এ লিখিতে লাগিলেন।]

সিদ্ধার্থ। কিছু না—কিছু না! ঠিক বাড়ির মতই আরামে আছি। আপনাদের যত্নে ব্যবহারে বাড়ির কথা আমার মনেই পড়ে না।

ডাক্তার। প্রায় তিন সপ্তাহ আপনি আছেন আমাকে যদি তিনদিন এভাবে থাকতে হোতো আমি হাঁপিয়ে উঠতাম।

সিদ্ধার্থ। দেখুন, স্বাচ্ছন্দ্যই সব নয়, স্বাস্থ্য সবার আগে। শরীরের জন্য যদি আরো তিন সপ্তাহ এখানে কাটাতে হয়, আমি এতটুকু কুণ্ঠিত নই। (ঢোঁক গিলিয়া)—হ্যাঁ—ভালো কথা, মঞ্জরী দেবীর ছুটি কবে ফুরোবে বলতে পারেন?

ডাক্তার। মিস্ মঞ্জরী মিত্র? আমাদের নার্স। তাঁর তো দু সপ্তাহের মোটে ছুটি। চিঠি পেয়েছি তাঁর, আজই তিনি জয়েন করবেন।

সিদ্ধার্থ। আজ?…আজকেই?

ডাক্তার। আপনার যেমন স্বাস্থ্যের প্রতি টান, সব বাঙালীর যদি এমন হোত। আপনি যদি আরো তিন সপ্তাহ থাকতে চান আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি ডাক্তার সাহেবকে বলে তার ব্যবস্থা করে দেব।

সিদ্ধার্থ। না না—কোন প্রয়োজন নেই। ভাবচি এখান থেকে কোথাও চেঞ্জে গিয়ে দেখি একবার। আপনি আমাকে একটা প্রেস্‌ক্রুপসন্ করে দেবেন—তাহলেই হবে।

ডাক্তার। সেই ভালো।

[চোখ-বাঁধা বৃদ্ধ রোগীর নিকটে গেলেন। তাহার গায়ে হাত দিতেই সে জাগিয়া উঠিল]

বৃদ্ধ। কে ?

ডাক্তার। দেখি আপনার হাতটা।

বৃদ্ধ। ভাল উৎপাত! একটু ঘুমোচ্চি—এত রাত্রে আবার কি হোল ?

নার্স। ডাক্তারবাবু আপনার হাত দেখতে চাচ্চেন।

বৃদ্ধ। ডাক্তারবাবু? ও! (হাত বাড়াইয়া দিল)। ডাক্তারবাবু, আজ সমস্ত দিন আমাকে এরা কিচ্ছু খেতে দেয় নি। সারাদিন আমি খিদেয় ছটফট করচি। সেই কাল রাত্রে যা খেয়েছিলাম—

ডাক্তার। (নার্সের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া) সে কি ?

নার্স। কাল আমি নিজে ওঁকে তিনবার খাইয়ে গেছি।

বৃদ্ধ। ডাক্তারবাবু, আপনি আমাকে বাঁচান, না খাইয়ে এরা আমাকে মেরে ফেললে।

ডাক্তার। আচ্ছা, এক্ষুণি আপনার খাবার আসবে। খাওয়ার সময় হয়েচে।

বৃদ্ধ। এত রাত্রে খাব ?

ডাক্তার। রাত ?—(নার্সের দিকে চাহিলেন)।

নার্স। পরশু থেকে ওঁর দিন রাত কেমন গোলমাল হয়ে গেছে।

ডাক্তার। ওঃ, তাই।

বৃদ্ধ। তা হোক, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আপনাকে দণ্ডবৎ ডাক্তারবাবু, আপনি বড় ভালো লোক।

ডাক্তার। আজ ডাক্তারসাহেব এলে আপনার চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে আবার আপনি দেখবেন—সূর্যের আলো, সুনীল আকাশ, সুন্দর পৃথিবী।

বৃদ্ধ। আপনাকে আশীর্বাদ করি ডাক্তারবাবু।

[ডাক্তার বৃদ্ধের রিপোর্ট শিট-এ লিখিয়া পাশের ঘরে গেলেন ; নার্স ও কুলীও গেল। ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর সিদ্ধার্থ শিশি থেকে এক দাগ ঔষধ গেলাসে ঢালিল ; জানালা দিয়া ঔষধটা বাহিরে ফেলিতে যাইবে এমন সময়ে সোমেশের প্রবেশ।]

সোমেশ। ফেলে দিলে ? এমন শক্ত অসুখ, আর—

সিদ্ধার্থ। অসুখ না ছাই !

সোমেশ। মানে ?

সিদ্ধার্থ। মানে শিশি গেলাস টিপয় সব কিছু ছুড়ে ফেলতে ইচ্ছে করচে।

সোমেশ। এত রাগ ?

সিদ্ধার্থ। এতই !

সোমেশ। কারণ ?

সিদ্ধার্থ। কারণ সেই মেয়েটি।

সোমেশ (আগ্রহে)। সেই মেয়েটি ? তাকে—তাকে দেখলে নাকি ? রাস্তায় ?

সিদ্ধার্থ। সে আজ আসচে।

সোমেশ। কোথায় ? এখানে ? বল কি ? বড়-বাজারের মোড়ে যে মেয়েটিকে দেখেছিলে তার কথা বলচ ?

সিদ্ধার্থ। না না। যার জন্য জেল হয়েছিল আমার।

সোমেশ। যাকে নিয়ে পালিয়েছিলে ?

সিদ্ধার্থ। পালালাম কোথায় ? কেবল চুমু খেয়েছিলাম তো !

সোমেশ। চুমু খেলে কি রকম ?

সিদ্ধার্থ। শোনো বলি। একদিন টাউনসেণ্ড রোড দিয়ে যেতে যেতে একটি মেয়েকে দেখলাম। খুব সুন্দরী যে তা নয়, তবে মিষ্টি বলতে যা বোঝায় তার মুখখানি তাই। আমি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছলাম কিন্তু যেতে পারলাম না। ফিরে আসতে হোল।

সোমেশ। তার পর?

সিদ্ধার্থ। সে যে কী তোমাকে বোঝাতে গেলে কবিত্ব করে ফেলব, আর হাজার কবিত্ব করেও বোঝাতে পারব না। চুমু নেবার জন্যই যেন সেই মুখ। আমি তার কাছে একটি চুমু চাইলুম।

সোমেশ। বল কি? চাইতে পারলে তুমি? একটি অচেনা মেয়ের কাছে?

সিদ্ধার্থ। কি করে যে পারলুম তাই ভাবি। তার সামনে সব আবার কি রকম যেন গুলিয়ে গেল। সমস্ত জগৎ যেন মুছে গেল, মনে হল আমরা অনন্ত কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে,—আমার সম্মুখে সেই মেয়েটি আর আমার পশ্চাতে মৃত্যু।

সোমেশ। মৃত্যু!

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, আমি, মেয়েটি আর মৃত্যু—তিনজন আমরা কাছাকাছি। আর আমার হাতে রয়েচে একটিমাত্র মুহূর্ত। সেই প্রথম ও শেষ মুহূর্ত; অনন্ত কাল পরে আমরা মিলেচি, অনন্ত কালেও আর মিলব না। সেই শুভলগ্নকে সার্থক করব, না, ব্যর্থ করব? আমি তাকে একটি চুমু দিলাম।

সোমেশ। চুমো দিলে?

সিদ্ধার্থ। আমার সম্মুখে সেই মেয়েটি আর আমার

পশ্চাতে মৃত্যু—নিরুদ্দেশ, যাত্রার পথে মুহূর্ত কালের জন্যই আমার মন দিয়ে তার মনকে ছুঁয়ে গেলাম।

সোমেশ। আশ্চর্য! তুমি নাকি কবি নও?

সিদ্ধার্থ। পরমাশ্চর্যের ছোঁয়ায় কতো আশ্চর্যই না জেগে ওঠে! পরশমণি যেমন লোহাকেও—

সোমেশ। কিছু বল্লো না সেই অচেনা মেয়েটি?

সিদ্ধার্থ। যে চেনা সেত ফুরিয়ে গেছে। অচেনার কাছেই আমাদের অভাবিতের প্রত্যাশা। আমি তাকে হতাশ করিনি।

সোমেশ। তারপর কি হোলো?

সিদ্ধার্থ। যা ঘটে থাকে। হোয়্যার্ দেয়ার ইজ্ বিউটি, দেয়ার ইজ্ এ বীস্ট! তারপর কোত্থেকে এক অপ্রিয়-দর্শন বীর পুরুষের আবির্ভাব হোল। সে আমাকে এই মারে কি সেই মারে!

সোমেশ। মেয়েটির আত্মীয়?

সিদ্ধার্থ। সেও মেয়েটিকে চেনে না। তার হচ্ছে নিছক সিভাল্‌রি!

সোমেশ। তোমার চুমো থেকে রক্ষা করে আমার চুমোর সুযোগ সৃষ্টি করব—তারই নাম সিভাল্‌রি, বন্ধু!

সিদ্ধার্থ। কিন্তু না মেরে পুলিসে দিলে। আমার হলো শাপে বর। আদালতে সেই মেয়েটিকে সাক্ষী দিতে হোল, তার পরিচয় পেলাম ঠিকানা জানলাম। সেই রহস্যময় চোখের দৃষ্টি এখনো আমার চোখে লেগে রয়েচে।

সোমেশ। কে সে? কোথায় থাকে?

সিদ্ধার্থ। বলচি—দাঁড়াও—

[নার্স দুধ ও পাঁউরুটি ডিসে করিয়া আনিয়া বৃদ্ধের সম্মুখের টিপয়ে রাখিল।]

নার্স। আপনার খাবার এনেচি।

বৃদ্ধ (বিরক্ত কণ্ঠে)। মাথা কিনেচ! সমস্ত দিন শুকিয়ে রেখে এত রাত্রে খাবার? এখন খেলে হজম হয় কখনো?

[খাইতে শুরু করিল। বিছানাপত্র লইয়া কুলীর প্রবেশ। যে লোহার খাটটি খালি ছিল তাহাতে শয্যা বিস্তৃত হইল।]

সোমেশ। কে আসছে আবার?

কুলী। এক গাঁটকাটা। ভারি জখম হয়েচে তার।

[কুলীর কাজ সারিতে সারিতে বৃদ্ধের খাওয়া শেষ হইল। তাহার ডিস প্রভৃতি লইয়া কুলীর প্রস্থান; আহার শেষ করিয়াই বৃদ্ধ শয়ন করিল।]

নার্স। আপনাদের খাবারও নিয়ে আসি? না, খাবার ঘরে যাবেন?

সিদ্ধার্থ। আমি খাবার ঘরে যাব।

সোমেশ। আমি আর একটু পরে।

[সিদ্ধার্থ ও নার্স প্রস্থান করিল। জিগার প্রবেশ; তার আধময়লা জামা কাপড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও

রক্তাক্ত। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জিগার সহিত ডাক্তার ও একজন পুলিস কনস্টেবল আসিল। জিগা যদিও অত্যন্ত উত্তেজিত তবু তাহাকে কেমন বিমর্ষ দেখাইতেছে।]

জিগা। শালারা! কার পকেট মেরেচি? কোন্ শালা দেখেচে? আমাকে নাহক মারলে? দেখব আমি—দেখে নেব শালাদের।

ডাক্তার। এই তোমার সীট।

জিগা (নিজের খাটে বসিয়া) শালাদের ভুঁড়ি যদি না ফাঁসিয়েছি তবে আমার নাম জিগাই নয়। ছাড়া পাই ত দেখে নেব শালাদের।

কনস্টেবল। আরে, তুম কেয়া দেখ গে? উস্ দফে ছ মাহিনা হুয়া থা, ইস্ দফে দো বচ্ছর! পাক্কা দো বচ্ছর! খানি ঘুমাও আউর মজেমে রহো!

জিগা (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)। ডাক্তার বাবু, ব্যাটাকে আমার চোখের সামনে থেকে যেতে বলুন। নইলে ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব।

[হাতের ও চোখের হিংস্র ভঙ্গী করিল।]

কনস্টেবল। কেয়া? হামারা টুঁটি?

ডাক্তার (কনস্টেবলকে)। তোমার এখানে থাকার দরকার নেই। তুমি সদর দরজায় গিয়ে বসো গে। ওর জখম সারতে দুতিন দিন লাগাবে। ওকে ছাড়বার আগে থানায় আমি খবর দেব।

[কনস্টেবল জিগার দিকে কোপকটাক্ষ হানিয়া বাহিরে গেল।]

ডাক্তার। তোমার কিছুর দরকার হয়, কুলীকে ডেকো। নার্সকে বোলো। তারা পাশের ঘরেই আছে।
[প্রস্থান।]

জিগা। শালারা!

সোমেশ। কেন একাজ করলে ভাই?

জিগা। বাবু মোটে আজ সকালে আমি জেল থেকে খালাস পেয়েছি। এখনও ঘর যাইনি। ঘরে আমার জরু আমার মেয়ে আমার পথ চেয়ে রয়েছে। ছ মাস তাদের দেখিনি বাবু, ছ মাস।

সোমেশ। কেন এ কাজ করলে তাহলে?

জিগা। ভাবলাম শুধু হাতে ঘর যাব? মেয়েটার জন্য মিঠাই নিয়ে যাই আর তার মায়ের জন্য রংদার জামা। আমিনা আমাকে লিখেছিল—তুমি জেল থেকে বেরিয়ে সোজা ঘর চলে এস, দলে ভিড় না—সুমরি রোজ তোমার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে আর বলে—বব্‌বা আসচে। এতটুকু মেয়ে আমার সুমরি।

সোমেশ। কেন সোজা বাড়ি গেলে না? কেন পকেট কাটতে গেলে?

জিগা। গ্রহের ফের বাবু, গ্রহের ফের! ছ'মাস দেখিনি, আরো কতদিন দেখতে পাব না। আবার ধরা পড়েচি, এবার এক বচ্ছরের কম দেবে না।

সোমেশ। যাঁর পকেট মারতে গেছলে তিনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। আমি এখান থেকে বেরিয়ে তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বলব। তিনি আদালতে বলবেন—তুমি পকেট মারনি। তাহলে হাকিম তোমাকে ছেড়ে দেবেন।

জিগা। ও শালা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার? তবেই ও বলেছে! ও শালা চোরের যাশু। আমাদের ভাত মেরে যত ব্যাটা বড় লোক, তাদের টাকার জিম্মাদার ওই শালা! ও বলবে ম্যাজিষ্টরকে ছেড়ে দিতে, আর ম্যাজিষ্টর আমায় ছাড়বে!

সোমেশ। কেন ছাড়বে না? তোমার বিরুদ্ধে তো আর কোন প্রমাণ নেই?

জিগা। ম্যাজিষ্টর যখন জানবে আমি আগে ছমাস জেল খেটেছি আর কোন কথা শুনবে না, কোন সাফাই চাইবে না। পাক্কা এক বছর ঠেলে দেবে। সব শালাকে আমি চিনি। জানতে আমার বাকী নেই।

[সিদ্ধার্থ প্রবেশ করিল।]

সিদ্ধার্থ। একি? জিগা যে? তোমাকেই ওরা ঠেঙাচ্ছিল নাকি?

জিগা। বাবু আপনি এখানে?

সিদ্ধার্থ। সোমেশ, এই সেই পকেটমার, যার কথা আমি তোমাকে বলছিলুম। এর নাম—তোমার কি নাম দিয়েছিলুম জিগা, মনে আছে?

জিগা। জিগ্‌সা।

সিদ্ধার্থ। জিগীষা। তোমার মধ্যে প্রবঞ্চিত পরাজিত সর্বহারা মানুষের সব কিছু জয় করার ইচ্ছা। তা, তুমি ছাড়া পেলে কবে?

জিগা। আজ সকালে।

সিদ্ধার্থ। আর আজই ধরা পড়ে গেলে? তোমাকে বলেছিলুম না সাবধানে কাঁচি চালাতে?

জিগা। সাবধানেই ত চালিয়েছিলুম বাবু। কিন্তু

জোঁকের গায়ে কি জোঁক বসতে পারে? তখন কি জানি ওশালা আরেক পাকিট্‌মার্? ডাকুর সর্দার ও?

সোমেশ। (হাসিতে হাসিতে)। হ্যাঁ, উনি তোমার মাস্তুত বড় দাদা!

সিদ্ধার্থ। এখন কি হবে? কি করবে?

জিগা। যা কপালে আছে হবেই। সুমরির জন্য ভারি মন খারাপ করছে বাবু, আর আমিনার জন্যও।

[নীচের রাস্তায় গোলমালের শব্দ]

সিদ্ধার্থ। আবার যেন কিসের গোলমাল?

[জিগা একলাফে জানালার কাছে গিয়া চাহিয়া দেখিল।]

জিগা (হতাশ ভাবে)। না, অন্য গোলমাল!

সোমেশ। ব্যাপার কি?

সিদ্ধার্থ। (জানালা দিয়া অনেকখানি ঝুঁকিয়া)। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সামনে ভয়ঙ্কর লোকের ভীড়। আর একখানা ধূসর রঙের মোটরের চার পাশে।

জিগা (ঝুঁকিয়া দেখিতে দেখিতে)। দেখছেন না বাবু, ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ। লোকগুলা হায় হায় করচে!

সোমেশ। ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বাললো নাকি?

সিদ্ধার্থ। অসম্ভব নয়।

জিগা (খুশি হইয়া)। বলছিলাম না আমার বড় ভাই! শালা তামাম্ লোকের পাকিট মারল! একসঙ্গে—একদিনেই!

সিদ্ধার্থ। লোকে শ্রীবিলাসবাবুর মোটর ছেঁকে ধরেচে।

সোমেশ। মারবে বোধ হয়। ঘুসি পাকাচ্ছে—দেখচ না?

জিগা। মারতে দিলে ত? দেখছেন না পুলিস ব্যাটারা শালার মোটর ঘিরে ওকে আগলে দাঁড়িয়েছে! আমি করলাম চুরি, পুলিস আমাকেই মারলে! আর ও শালাও করল চুরি, পুলিস লোকের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে ওকে!

সিদ্ধার্থ। জিগা, একেই বলে—এক যাত্রায় পৃথক ফল!

জিগা। ওশালা থানায় আগে খবর দিয়ে পুলিস ডেকে তারপর ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করেছে বাবু! দেখবেন, পুলিস ওর গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেবে না, ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। বাবু, আমি বহুৎ দেখলাম—ভগবান আর পুলিস, এ বড় লোকের বাঁধা!

সোমেশ। এ বলে কি সিদ্ধার্থ?

সিদ্ধার্থ। ঠিকই বলচে! বহুকালের অভিজ্ঞতা ভোলা তো সহজ নয়। আরে, আরে—

জিগা। দেখচেন বাবু, পুলিস লোকগুলোকেই মেরে হটিয়ে দিচ্চে! দেখুন দেখুন!

সিদ্ধার্থ। তাইত দেখচি!

[নীচের থেকে আর্তধ্বনি—গোলমাল অত্যন্ত বাড়িয়া ক্রমশঃ থামিয়া গেল।]

বৃদ্ধ লোকটি। (জাগিয়া) আবার কিসের গোলমাল?

[কেহ উত্তর দিল না।]

বৃদ্ধ। নাঃ, আজ রাত্রে দুনিয়া শুদ্ধ লোক ক্ষেপেচে। সবাই লেগেচে আমার পেছনে। কারো চোখে ঘুম নেই, আমাকেও একটু ঘুমুতে দেবে না। আমাকে মারবে এরা!

[সকলে নীরব। গোলমাল শান্ত হইলে সে পাশ ফিরিয়া শুইল।]

জিগা। দেখলেন বাবু, লোকগুলোকে নাহক্ মার খেতে দেখলেন? ওরাই একটু আগে পুলিসের সঙ্গে মিলে আমাকে মারছিল।

সিদ্ধার্থ। মার যা খেলো তাতো সামান্যই। তুমি জানো না জিগা, ওদের অনেকের আজ কী সর্বনাশ হয়ে গেল!

জিগা। ওরা টাকা দিয়ে চোর বাবু, টাকা দিয়ে চোর। ওদেরই টাকা গেল আবার ওরাই খেল মার।

সোমেশ। প্যাঁজ ও পয়জার—দুই হোলো!

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, যা বলেছো! (জিগাকে) আজ সকালে তুমি ছাড়া পেয়েছ বলছিলে না? আজ ভোরেই তো ওখানে বিস্‌মিলের ফাঁসি হয়ে গেল?

[বিস্‌মিলের নামে জিগার চোখ জ্বলিয়া উঠিল।]

জিগা। হাঁ, আজ ভোরবেলায়। আমরা সবাই দেখেচি।

সিদ্ধার্থ। সেই অগ্নিগর্ভ যুবক—বিদ্রোহী বিস্‌মিল!

জিগা। আপনারা যাকে কবি বলেন বাবু, বিস্‌মিল ছিল তাই।

সোমেশ। (সোজা হইয়া বসিয়া) কবি? বিস্‌মিল কবি?

জিগা। ফাঁসি-কাঠে উঠে সে গজল গাইলে।

সোমেশ। বিস্‌মিল কবি? কবি যদি তবে কেন জীবনটাকে এমন করে উড়িয়ে দিলে? নিজেকে পরিপূর্ণ না করে এভাবে নিঃশেষ করল?

সিদ্ধার্থ। সত্যকারের যে কবি সে তো জীবন দিয়েই কবিতা লেখে ভাই। রবীন্দ্রনাথ কি জীবন দিয়ে কবিতা লেখেন নি? কাগজের পাতায় যে কবিতা লেখা হয় সে তো তুচ্ছ,—জীবনের ছন্দে রূপ ধরে, সেই রচনাই তো আসল কবিতা!

সোমেশ। বিস্‌মিল কবি!

জিগা। ফাঁসি-কাঠে উঠে সে গান গাইলে—ফাঁসির গান! আমরা সবাই শুনলাম।

সোমেশ। মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে সে মুখে মুখে বাঁধলে কবিতা? গাইলে গান?

সিদ্ধার্থ। তোমরা শুনলে কি করে? তোমাদের তো ফাঁসির সময়ে বেরুতে দেয়নি?

জিগা। না দেওয়াই কানুন বটে। কিন্তু জেল ভেঙে পালাবার জন্য সবাইকে ও একজোট করেছিল কিনা—

সিদ্ধার্থ। সত্যিই তাই? কাগজে সেইরকম লিখেছিল বটে।

জিগা। হাঁ, সেইজন্যই ত তার ফাঁসি। তাই সব কয়েদীকে শিক্ষা দেবার মৎলবে সবাইকে দেখালে। যাতে ভয় পেয়ে জোট ভেঙে যায়। কিন্তু জোট কি ভাঙবার? ফাঁসির বাঁধনে এ জোট আরো মজবুৎ হোলো বাবু।

সোমেশ। কিরকম ?

জিগা। যখন বিস্‌মিলের ফাঁসি হয়ে গেল, তার লাশ দড়িতে ঝুলছে তখনি সব কয়েদীর চোখে চোখে পরামর্শ হয়ে গেছে। আজই ওরা জেল ভেঙে বেরুবে। যখন খাবার ঘণ্টি পড়বে, সবাই খেতে এক হবে—তখনই। আর বেশি দেরি নেই বাবু।

সিদ্ধার্থ। জেল ভেঙে বেরুবে ? পাগল! ওই শক্ত শক্ত মোটা মোটা লোহার গরাদ ? ওই গেট ? ওই পাঁচ হাত পুরু প্রাচীর! ওই ভেঙে বেরুবে ?

জিগা। দেখবেন বাবু, দেখবেন। বেরুবে ঠিক।

সোমেশ। বিস্‌মিল যে গান গেয়েছিল তোমার মনে আছে জিগা ?

জিগা। দুতিন পদ মনে আছে। বিস্‌মিল যখন ফাঁসিকাঠে দাঁড়ালো, জেলার সাহেবের হুকুমমত জল্লাদ তাকে পুছলো তখন—কি তোমার মন চায় বলো ?

সিদ্ধার্থ। ফাঁসির দড়ি পরানোর আগে ওটা দস্তুর!

সোমেশ। কী নিষ্ঠুর পরিহাস! ইংরেজদের কয়েদ-খানাতেই কেবল সম্ভব।

সিদ্ধার্থ। এমন পরিহাস শুধু সভ্য লোকেরাই করতে পারে!

জিগা। বিস্‌মিল কিছু না বলে' তার গজল ধরল—
সর্‌ ফরোশি কে তমান্না আজ্‌ হামারে দিল্‌মে হ্যায়্‌।
দেখ্‌না হ্যায়্‌ জোর্‌ কেত্‌না বাজু এ কাতিল্‌মে হ্যায়্‌॥

সবটা আমার মনে নেই।

সোমেশ। এতো উর্দু গান। এর বুঝব কি ?

সিদ্ধার্থ। জিগা, তুমি তো উর্দু বোঝো। গানটার ভাবখানা বুঝিয়ে বলত।

জিগা। বাবু, এর মানে হচ্ছে—আমি কুর্‌বানির সামনে দাঁড়িয়ে, এখন আমার দিল্ কি চায় তুমি জিজ্ঞাস করচ! এই জল্লাদ, হায়, যার পায়ের ফাঁসি দূর করতে চাইলুম সে-ই আমার গলায় ফাঁসি পরিয়ে দিচ্চে! যে-হাতে সে আমায় ফাঁসি পরাবে আমি তার সেই হাতের—সেই কোতলের বাজুর জোর কত একবার দেখব।

সোমেশ। বিস্‌মিল! বিস্‌মিল!!

সিদ্ধার্থ। গানটার মানে বোধহয় তা নয়। কোতল ত ঐ জহ্লাদ না, কোতল ইংরেজ। বিস্‌মিল তা জানত।

সোমেশ। দেখল সে কোতলের কব্জির জোর?

জিগা। মরবার আগে তার অদ্ভুত সাধ! বিস্‌মিল জল্লাদের হাত তার নিজের হাতের মধ্যে নিল। দোস্ত যেমন করে দোস্তের হাত চেপে ধরে তেমনি করে চেপে ধরল! আমি দেখেচি, জল্লাদকে শিউরে উঠতে আমি দেখেচি।

সোমেশ। ওরে জল্লাদ, তুই ধন্য হয়ে গেলি, তুই ধন্য হয়ে গেলি!

জিগা। তারপর বিস্‌মিল্ ফাঁসির দড়ির চুমা খেল। গলা বাড়িয়ে তৈরি হোলো সে। ফাঁসির দড়ি পরাতে গিয়ে জল্লাদের হাত কাঁপছিল। আমি দেখেচি কাঁপতে, আমি দেখেচি।

সোমেশ। তারপর—সব শেষ!

জিগা। শেষ নয়, বাবু—শুরু, তারপর শুরু।

[জেলে খাবার ঘণ্টা পড়ল]

ওই শুনুন খাবার ঘণ্টি। এইবার শুরু হবে—

[তিনজনেই জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে—]

সোমেশ। কই কিছু না তো। সব চুপ।

সিদ্ধার্থ। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

জিগা। (বিমর্ষ মুখে) বিস্‌মিলের মরা মুখের দিব্যি তারা ভুলবে, এতো শীগ্‌গির, এ-তো হতেই পারে না বাবু!

সিদ্ধার্থ। তুমি পাগল হয়েচ জিগা? .না ভুলে তারা করবে কি? দেখছ ত ওই জেলের গেট—মোটা মোটা লোহার গরাদ! ওই ভেঙে কেউ কখনো বেরুতে পারে?

সোমেশ। অসম্ভব!

জিগা। তাদের লছমি তাদের সুমরি তাদের আমিনা কি তাহলে চিরদিন পাঁচিলের বাইরেই থাকবে বাবু? আর তারা থাকবে ফাটকের ভিতর? কোনদিন তাদের আর মিল হবে না?

সিদ্ধার্থ। এমনি করেই যে আমরা সমাজ গড়েচি ভাই।

সোমেশ। খাবার ঘণ্টা যখন পড়েচে তখন খেতে যাওয়া যাক। তুমিও এসো জিগা। খেয়ে নাও কিছু।

জিগা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) চলুন।

[সোমেশ ও জিগা প্রস্থান করিল।
মঞ্জরীর প্রবেশ। সিদ্ধার্থ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

সিদ্ধার্থ। আসুন মঞ্জরী দেবী! এতদিনে এই অভাগাকে মনে পড়ল? আমি যে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে এতদিন ধরে অকারণে তেতো ওষুধগুলো অকাতরে গিলেছি আমার সেই কৃচ্ছ্রসাধন কি এতোদিনে সিদ্ধ হোলো?

[মঞ্জরী স্থির-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।]

সিদ্ধার্থ। আমি ভাবলুম আমার হাত এড়াতে তুমি বুঝি নার্সিং হোম্‌ই ছেড়ে দিলে।

মঞ্জরী। তোমার হাতে কি আমার নিস্তার নেই? কেন তুমি এমন করে' আমার পেছনে লেগেছ?

সিদ্ধার্থ। পেছনে লাগতুম না, যদি তুমি প্রথমেই আমাকে একটি চুমু দিতে। নিজের থেকেই দিতে— যদি আমায় কেড়ে নিতে না হোতো। সেইখানেই চুকে যেত। তুমিই ত এক মুহূর্তের তৃষ্ণাকে চিরদিনের করে তুলেচ।

মঞ্জরী। পথের মাঝে তোমাকে আমি চুমো দিতে গেলুম কেন?

সিদ্ধার্থ। আশ্চর্য প্রশ্ন!

মঞ্জরী। আশ্চর্য প্রশ্ন আমার, না, তোমার—তোমার সেই চাওয়াটা?

সিদ্ধার্থ। চাওয়া আমার অপরাধ নয়—সে তোমার সৌন্দর্যের অপরাধ। তুমি সুন্দর হতে গেলে কেন?

[মঞ্জরী কথা কহিল না।]

সিদ্ধার্থ। জবাব দাও। ফুলের ঘ্রাণ নেবার আমার যে-অধিকার, সুন্দরের চুমু খাবার আমার সেই অধিকার।

মঞ্জরী। অভদ্র!

সিদ্ধার্থ। সুন্দরের সামনে আর মৃত্যুর সম্মুখে কোনো ভদ্রতা নেই মঞ্জরী দেবি! সেখানে ভদ্রতার মানে, কাপুরুষতা। বোকামি।

মঞ্জরী। বর্বর!

সিদ্ধার্থ। তুমি ঝগড়া করতে চাও, না, আমার দাবী মেনে নিতে চাও?

মঞ্জরী। কিসের দাবী?

সিদ্ধার্থ। তা তো তুমি জানো।

মঞ্জরী। তোমার দাবী মানতে গেলুম কেন? তুমি আমার কে? আমি তোমাকে চিনিও না।

সিদ্ধার্থ। এক মুহূর্তের পরিচয়ে যা চিনি, জানতে পারি, সারা জীবনের সম্পর্কে কি তার চেয়ে কিছু বেশি জানা যায়?

মঞ্জরী। তোমার কিছুই আমি জানি না, জানতেও চাই না।

সিদ্ধার্থ। কিন্তু তোমার আর কিছুই আমার জানবার নেই, কেন না তোমার সমস্তই আমি জানি।

মঞ্জরী। কী জানো আমার? আমি এখানকার নার্স, এই ত? আমি যদি নার্সিংহোম ছেড়ে দিই?

সিদ্ধার্থ। যা আমাদের জানবার তা আমরা দুজনেই জেনেচি। পরস্পরের সম্বন্ধে এর বেশি জানার দরকার করে না। তুমি সুন্দর আমি তা জানি। তুমি জানো আমি তোমাকে ভালবাসি। এই যথেষ্ট।

মঞ্জরী। তুমি আমার গ্রহ! তুমি আমার রাহু!

সিদ্ধার্থ। ঠিক বলেচ। আমার কবলেই তোমার সর্বনাশ, আবার আমার কবলেই তোমার নবজন্ম!

মঞ্জরী। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

সিদ্ধার্থ। তার মানে তুমি নিজেকে ঘৃণা কর।

মঞ্জরী। তার মানে?

সিদ্ধার্থ। তার মানে তুমি নিজেকে পূজার যোগ্য মনে কর না, তাই আমার পূজা সহ্য করতে পার না। দেবতা কখনো ভক্তকে বাধা দেয় না—ভক্তির অধিকারে সে তার আত্মীয়।

[মঞ্জরী নীরব।]

সিদ্ধার্থ। যে তোমায় লাঞ্ছনা করে—তোমার সর্বস্বকে খেলনা মনে করে—তার কাছে হয়ত তুমি আপনাকে দাও, তার প্রতি তোমার বিরাগ নেই। কেবল যে তোমার পূজা করতে চায় তার প্রতিই তোমার যতো রাগ?

মঞ্জরী। কী চাও তুমি আমার কাছে?

সিদ্ধার্থ। সুখ নয়, শান্তি নয়, সন্তান নয়—তোমার রহস্যময় অস্তিত্বের মধ্যে নিজের রহস্যময় অস্তিত্ব অনুভব করতে চাই। একটুক্ষণের জন্য—এই শুধু।

মঞ্জরী। তার মানে?

সিদ্ধার্থ। তার মানে, সোজা বাঙলায়, তোমার সহজ বন্ধুত্বই আমার কাম্য। তোমাকে আমার বন্ধুর মতই পেতে চাই। যে-বাঁধনে তুমিও মুক্ত, আমিও মুক্ত—দুজনেই স্বচ্ছন্দ। তুমি কি আমার বন্ধু হতে পারো না?

মঞ্জরী। বন্ধু! কিন্তু কিসের জন্যে?

সিদ্ধার্থ। বন্ধুত্বের জন্যেই—আবার কি? বন্ধুর মতই আমরা মাঝে মাঝে মিলব, খাবো দাবো বেড়াবো—সিনেমা দেখবো একসঙ্গে—

মঞ্জরী। বন্ধুত্ব! আমার সঙ্গে কোনো···আমার দেহ তুমি চাওনা?

সিদ্ধার্থ। না। তোমার স্নেহ যদি অপরের হয় তাও অপরের জন্যই থাক।

মঞ্জরী। আমার স্নেহও তুমি চাও না?

সিদ্ধার্থ। পেলে বড়ই ভাল হয়। কিন্তু না পেলেও দুঃখ নেই। আমি চাই জীবনের দীর্ঘ মরু-যাত্রার মাঝে মাঝে তোমার ক্ষণকালের সঙ্গ; আমার চোখে তোমার সৌন্দর্য, কানে তোমার কণ্ঠস্বর, ঐ সুরের ছোঁয়া, মনে তোমার মাধুরীর ছোঁয়াচ—এই কেবল।

[মঞ্জরী নীরব।]

সিদ্ধার্থ। আমরা কি বন্ধুর মত মিলতে পারিনে মাঝে মাঝে?

মঞ্জরী। কি করে পারি? আমি নারী, যুবতী, তুমি পুরুষ, আমরা আত্মীয় নই।

সিদ্ধার্থ। এখনো তুমি বলচ আমরা আত্মীয় নই?

মঞ্জরী। নিশ্চয়ই নই। তবে হয়ত হতে পারি। সেই কথাই আমি ভাবচি।

[কুলীর প্রবেশ। হাতে একটুকরো কাগজ—কাগজখানা মঞ্জরীকে দিল।]

কুলী। ডাক্তার বাবু দিলেন। [প্রস্থান করিল।]

সিদ্ধার্থ। ডাকচেন বুঝি তোমাকে ?

[দূরে অস্পষ্ট কোলাহল-ধ্বনি।]

মঞ্জরী। হ্যাঁ। আমি কাজে ইস্তফা দিয়েচি, তাই পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করেচেন।

সিদ্ধার্থ। ইস্তফা দিয়েচ ?

মঞ্জরী। হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ। ইস্তফা দেবার জন্যই বোধহয় আজ তোমার আসা ? আমার জন্যই বোধ হয় কাজ ছাড়তে হোল ?

মঞ্জরী। তোমার অনুমান-শক্তি আছে দেখচি।

সিদ্ধার্থ। তুমি পুনর্বিবেচনা করবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি করেচি। এই মুহূর্তেই করলাম। তুমি যদি বলো আমি এই মুহূর্তেই এখান থেকে চলে যাব, আর কোন দিনও এমুখো হব না।

মঞ্জরী। তোমার সমস্ত দাবী প্রত্যাহার করে ?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ।

মঞ্জরী। আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে ?

সিদ্ধার্থ। নিষ্কৃতি ? হ্যাঁ, চিরদিনের মতই নিষ্কৃতি দিয়ে।

মঞ্জরী। আচ্ছা, ভেবে চিন্তে বলব। এ সব তাড়াহুড়োর কাজ নয়। সমস্তই পুনর্বিবেচনা করতে হবে। আমি আবার—ওই বিবেচনা-কাজটা এক মুহূর্তেই করতে পারি না। এখন একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাই।

[মঞ্জরী প্রস্থান করিল। দূরের কোলাহলধ্বনি ক্রমশই নিকটতর ও উচ্চতর হইতে লাগিল—ক্রমশ আগাইয়া যেন জেলের প্রাচীরের অপর পার্শ্বে আসিয়া পৌঁছিল। জেলের য়্যালার্ম বেল বাজিতে লাগিল। জিগারের লাফাইতে লাফাইতে প্রবেশ—হাতে অর্ধভুক্ত পাঁউরুটি। সোমেশ তাহার পিছনে। পাগলা-ঘন্টি নিরবচ্ছিন্ন বাজিয়া চলিয়াছে।]

জিগা। পাগলা ঘন্টি বাজছে—পাগলা ঘন্টি! শুনছেন বাবু, শুনছেন?

[হাতের রুটিতে এক কামড় দিল।]

সিদ্ধার্থ। সত্যিই হাঙ্গাম বাধল তাহলে?

জিগা (রুটির টুকরাটি ছুঁড়িয়া)। ভাঙ, ভেঙে ফেল—গুঁড়িয়ে দে!

বৃদ্ধ (উঠিয়া বসিল)। আগুন! আগুন! আমাকে বাঁচাও। আ আ আ!

[যতক্ষণ গোলমাল চলিল, বৃদ্ধ অসহায়ের মত মাঝে মাঝে আর্তনাদ করিতে থাকে।]

সিদ্ধার্থ। ওরা সদর গেটে এসে পড়েচে।

সোমেশ। গেটের পাহারাওয়ালাকে বসিয়েচে। বেচারা লুটিয়ে পড়ল!

জিগা (উত্তেজিত কণ্ঠে)। মার শালাদের। মেরে ফেল। শয়তান শালারা।

বৃদ্ধ। আ আ আ!

সিদ্ধার্থ। লোহার গরাদে হাতুড়ির বাড়ি মারচে।

সোমেশ। কী বীভৎস আওয়াজ!

জিগা। ভেঙে ফেল্ ওই পাঁচিল, ওই লোহার গেট! চুরমার করে দে, চুরমার করে দে!

বৃদ্ধ। আ আ আ! আ আ আ!

সিদ্ধার্থ। যে শক্ত গরাদ! সহজে কি ভাঙে?

সোমেশ। এ কি, হাতুড়িও যে ভেঙে গেল!

জিগা। কী ফুর্তি! পাগলা ঘন্টি বাজছে, পাগলা ঘন্টি!

সিদ্ধার্থ। ধাক্কা মারচে, লোহার গেটে ধাক্কা মারচে!

সোমেশ। গোটা গেটখানা কাঁপচে, ভেঙে পড়ল বলে!

জিগা। আর একটু, আর একটু! বাঃ যোয়ান, বাঃ যোয়ান!

বৃদ্ধ। আ আ আ! আ আ আ!

সিদ্ধার্থ। লোকগুলো ক্ষেপে গেছে। সত্যি ক্ষেপে গেছে।

সোমেশ। সামনে পথ—মুক্ত পথ। উদার পৃথিবী! কেবল একটা গেটের মাত্র ব্যবধান!

জিগা। হাতুড়ি গেছে, হাত আছে ভাই। মার্ হাতের বাড়ি, মার্ ঘুসি, মার্ লাথি! ভেঙে ফেল্, ভেঙে ফেল্!

বৃদ্ধ। আ আ আ! আ আ আ!

সোমেশ। সত্যিই তো মারছে, কব্জির বাড়ি মারচে! ত্যাখো ত্যাখো! হাত কেটে রক্ত পড়চে। হাত ওদের রক্তাক্ত!

সিদ্ধার্থ। একজনের হাত ভাঙল! কিন্তু দেখচ, হুঁস নেই, জ্ঞান নেই। ওদের কি লাগচে না?

জিগা। জল্লাদ তার হাত ভেঙেচে! তার ফাঁসির হাত!

সোমেশ। দেখ দেখ—কী সর্বনাশ!

সিদ্ধার্থ। লোহার গরাদে ওরা মাথা ঠুকচে। মাথা ঠুকচে ওরা!

জিগা। বেরিয়ে আয়, মরদ্ বাচ্চা, বেরিয়ে আয়!

বৃদ্ধ। আ আ আ! আ আ আ!

সিদ্ধার্থ। রক্ত, রক্ত! গরাদের গায়ে রক্ত! মাথার খুলি ভাঙা তাজা রক্ত!

সোমেশ। কালো গরাদ লাল হয়ে উঠেচে!

জিগা। লালে লাল! আমরা মুক্তি চাই, মুক্তি চাই!

সিদ্ধার্থ। ওরা কথা বলচে, কথা বলচে! মাথার খুলি ভেঙে ওদের কথা! রক্ত দিয়ে ওদের কথা!

জিগা। সব ভেঙে ফেলব, কিচ্ছু রাখব না! সব গুঁড়িয়ে দেব! সব সমান করে দেব!

বৃদ্ধ। আ আ আ! আআআ!

সিদ্ধার্থ। শুনচ সোমেশ, শুনচ ওদের কথা! আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

সোমেশ। বহুদিনের মৌনতা যখন ফাটে, এমনি করেই বুঝি ফাটে!

জিগা। সব মুখ লাল! সব মুখ এক! সব মুখ রক্তমাখা! তোদের কাউকে আর চিনতে পারছি না!

বৃদ্ধ। আ আ আ! আ আ আ!

সিদ্ধার্থ। ওরা শোধ নেবে—শত্রুর ওপরে শোধ নেবে, নিজের ওপরে শোধ নেবে! ওরা পারে—ওরাই পারে।

সোমেশ। দেখচ না—রক্তাক্ত গেট। নিজের ওপরে শোধ নিচ্চে।

জিগা। সর্বনাশ হোল! সর্বনাশ হোল! ফৌজ এসে পড়ল!

সিদ্ধার্থ। তাইত, মিলিটারি এসে পড়েচে!

সোমেশ। একটা গরাদও ভাঙেনি—যে মোটা গরাদ!

[নেপথ্যে ফটাফট্ গুলির আওয়াজ।]

জিগা। মেরে ফেললে! আমার জোয়ান ভাইদের মেরে ফেললে! হায় হায়! সব গেল। হায় হায়!

[বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল।]

বৃদ্ধ। আ আ আ! আ আ আ!

সিদ্ধার্থ। পাঁচ ছ জন পড়েচে। রক্তে মাটি ভেসে গেল। ইস্, কী রক্ত।

সোমেশ। পালাচ্চে ওরা পালাচ্চে, বন্দুকের সামনে কতক্ষণ দাঁড়াবে?

জিগা। আমি লড়ব। ওদের হয়ে আমি লড়ব। আমার একটা বন্দুক চাই!

[লাফাইয়া জানালার উপরে উঠিল; নিচে পড়িতে যাইবে এমন সময়ে সিদ্ধার্থ পিছন হইতে ধরিয়া ফেলিল।]

জিগা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) কী ?

সিদ্ধার্থ। (তাহাকে মেজেতে নামাইয়া) এত উঁচু থেকে পড়লে বাঁচবে ? ছাতু হয়ে যাবে।

জিগা। (হিংস্র চোখে চাহিয়া) তুমি ভদ্দর লোক ? তুমি বড়লোকের দিকে ? তুমি আমাদের ফাটক দাও ? তুমি আমাদের দুষ্‌ন্‌, তোমাকে শেষ করব।

[গলার টুঁটি টিপিয়া ধরিল]

[সোমেশ ভয়বিহ্বল চোখে নিশ্চল নির্বাক হইয়া চাহিয়া।]

জিগা। নাঃ! তুমিও ফাটক গেছলে। তুমি আমাদের দলে। তুমি দোস্ত !

[ছাড়িয়া দিল। জানালার কাছে গিয়া বাহিরে চাহিল। ততক্ষণে বন্দুকের আওয়াজ বন্ধ ; গোলমালও একেবারে কমিয়া আসিয়াছে। পাগলা ঘণ্টি থামিয়াছে।]

জিগা। সব শেষ। সব শেষ ! লাশগুলো ভেতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যোয়ান্‌ ভাই সব, জান্‌ দিলি, বেরুতে পারলি না।

[মুহ্যমান হইয়া মুখ ঢাকিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। উত্তেজনার জন্য ক্ষতমুখ ফাটিয়া রক্তস্রাবে মাথার সাদা ব্যাণ্ডেজ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারের প্রবেশ।]

ডাক্তার। কী বিপদ। কী বিপর্যয় ! দশজন রুগী ফেইণ্ট !

সিদ্ধার্থ। আমাদের কিছু হয় নি।

ডাক্তার। সোমেশবাবু, উত্তেজিত হবেন না, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, শুয়ে পড়ুন। আপনাকে বড় বিভ্রান্ত দেখাচ্চে; শুয়ে পড়ুন। আপনার বিশ্রাম দরকার।

সোমেশ। ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, আমি ভালো আছি।

ডাক্তার। জিগা, একি? তোমার মাথায় কী হোল? চোট লাগল নাকি?

জিগা। (মাথায় হাত দিয়া দেখিল) রক্ত!

ডাক্তার। নার্স!

[পাশের ঘর হইতে নার্স আসিল—ভয়ে
পাংশুমুখ ও বিহ্বল দৃষ্টি।]

একে ড্রেসিং রুমে নিয়ে যাও। মাথাটা আবার ব্যাণ্ডেজ করতে হবে।

[জিগাকে লইয়া নার্স প্রস্থান করিল। ডাক্তার
বৃদ্ধ লোকটির কাছে গেলেন।]

আপনি কেমন আছেন?

বৃদ্ধ। (গোঙাইয়া) আ আ আ! আ আ আ!

সিদ্ধার্থ। উনি বড্ড ভয় পেয়েছেন।

ডাক্তার। (নাড়ি ও বুক পরীক্ষা করিয়া) সর্বনাশ! সর্বনাশ হয়েচে। নার্স—নার্স!

[মঞ্জরী প্রবেশ করিল।]

মঞ্জরী। কি বলুন।

ডাক্তার। কোরামিন্—কোরামিন্! এক্ষুণি ইনজেক্ট করতে হবে। হার্ট-এর অবস্থা ভালো নয়।

[মঞ্জরী প্রস্থান করিল ও ক্ষণপরেই ইনজেক্সনের ঔষধ-সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধকে ইনজেক্সন দেওয়া হইলে, সরঞ্জামাদি লইয়া মঞ্জরীর প্রস্থান]

ডাক্তার। কোনো ভয় নেই। আর কোনো হাঙ্গামা হবে না। গোটা কতক কয়েদী মরেচে, ব্যাড ব্লাড বেরিয়ে গেচে—সব ঠাণ্ডা। জেলের ভেতরে পুলিস শান্তিরক্ষা করচে। আর ভাবনার কিছু নেই।

[জানালার কাছে গিয়া বাহিরে চাহিলেন।]

দেখুন, হাঙ্গামার চিহ্নমাত্রও নেই আর। সোল্জাররা চলে গেছে। রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলেচে—রাস্তা সাফ! লোকজন আবার যাতায়াত করচে। কিছুক্ষণ আগে এখানে যে খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে তা ধারণা করাও এখন শক্ত।

সিদ্ধার্থ। কিন্তু ঐ গরাদের গায়ে?

ডাক্তার। গরাদের গায়ে কি?

সিদ্ধার্থ। রক্তের দাগ!

ডাক্তার। কই দাগ তো নেই। হোস্ পাইপে

জল ছিটিয়ে কখন্ ধুয়ে ফেলেচে! পরিষ্কার! ইংরেজ সরকারের কাজ কি নিখুঁৎ! গুলি করতেও যেমন, হত্যার দাগ মুছে ফেলতেও তেমনি।

[ডাক্তার পাশের ঘরে গেলেন।]

সোমেশ। ডাক্তার বলেছে মিছে নয়। একটু আগে যে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল রাস্তায় এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। যদিচ লোকগুলো ভয়ে ভয়ে পথ হাঁটচে।

সিদ্ধার্থ। হুঁ।

সোমেশ। যারা মরবার তারা তো মরে একরকম এড়িয়ে গেল। যারা বেঁচে রইল তাদের খুব কঠোর শাস্তি হবে, নয় কি? তুমি তো জেলের ব্যাপার জানো, কি বল?

সিদ্ধার্থ। হুঁ।

সোমেশ। কী ভাবচ? কয়েদীদের বরাত?

সিদ্ধার্থ। না, নিজের বরাত। এই মাত্র যে নার্সটি এল, তাকে দেখলে?

সোমেশ। দেখেচি। কেন?

সিদ্ধার্থ। ওর নাম মঞ্জরী। কেমন লাগলো ওকে?

সোমেশ। কি রকম লাগবে?

সিদ্ধার্থ। কি রকম দেখতে? খুব সুন্দর নয়?

সোমেশ। সুন্দর বই কি।

সিদ্ধার্থ। তোমার চোখ আছে। হাতে হাত দাও। তুমি নাট্যকার বটে। তুমি ওকে ভালোবাসতে পারো?

সোমেশ। ওকে ভালোবাসবো? কেন?

সিদ্ধার্থ। কেন! অমন সুন্দর মেয়ের প্রেমে পড়াটা কি খুব আশ্চর্য ব্যাপার?

সোমেশ। না, তা নয়। তবে এত শীগগির? এই তো প্রথম দেখচি, ওর সঙ্গে একটা কথাও হয়নি আমার।

সিদ্ধার্থ। লোকে কি বলে কয়ে প্রেমে পড়ে নাকি? ওতো মুহূর্তের ব্যাপার?

সোমেশ। তাহলে বলতে হবে মঞ্জরীর সম্পর্কে সেই শুভ মুহূর্ত এখনো আমার আসে নি।

সিদ্ধার্থ। নাঃ, তোমার নাট্যকার হতে ঢের দেরি এখনো। তোমার নিজের মধ্যেই কোনো ড্রামা নেই—না কমেডি, না ট্রাজেডি!

সোমেশ (হাসিয়া)। নাই থাক্‌। তোমার নাটকই নাহয় লিখব হে! সিদ্ধার্থ, দেখ দেখ, জেলের দেয়ালে থিয়েটারের নতুন প্লাকার্ড মারচে না?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, তোমার 'ভবিষ্যতের'।

সোমেশ। "সহস্র কণ্ঠে যাহার প্রশংসা—সেই অপূর্বতম আধুনিক নাটক—ভবিষ্যৎ—কাহার রচনা জানিতে চান? প্রতীক্ষায় থাকুন।" কিন্তু আমার নাম দেয় নি ত।

সিদ্ধার্থ। এইবার দেবে। এর পরের প্লাকার্ডে দেবে মনে হয়। অখ্যাত লেখককে বিখ্যাত করবার এ একটা থিয়েটারি চাল। ব্যবসাদারি কায়দা।

সোমেশ। আমার জন্য অধিকারী এত যত্ন নিচ্চেন?

বড় মহৎ লোক ! অতি উদার ভদ্রলোক ! জন্মের মত আমি তাঁর কেনা হয়ে রইলুম। দাঁড়াও, প্লাকার্ডওলাকে গিয়ে একটা কথা জিজ্ঞেসা করে আসি।

[বাহির হইয়া গেল। মঞ্জরীর প্রবেশ।]

মঞ্জরী। সিদ্ধার্থ !

সিদ্ধার্থ। কে? মঞ্জরী ? মঞ্জরী দেবী !

মঞ্জরী। এর পর থেকে আমাকে শুধুই মঞ্জরী বোলো।...মঞ্জুও বলতে পারো।

সিদ্ধার্থ। তাহলে আমার আবেদন মঞ্জুর ?

মঞ্জরী। হ্যাঁ। আমি আজই বাবার অনুমতি নেব।

সিদ্ধার্থ। বাবার অনুমতি ? কেন, কিসের জন্য ?

মঞ্জরী। আমাদের বিবাহের।

সিদ্ধার্থ। বিবাহ ?

মঞ্জরী। বিস্মিত হচ্ছ ? তুমি কি আমাকে আত্মীয় করতে—একান্ত আপনার করতে চাওনি ?

সিদ্ধার্থ। চেয়েচি। চুম্বনের অধিকারই চেয়েছি, চর্বনের নয়। আমি শুধু তোমার বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম।

মঞ্জরী। বিবাহের চেয়ে বড় বন্ধুত্ব আর কি হতে পারে ?

সিদ্ধার্থ। বিবাহ বন্ধন। বন্ধুত্ব বিবাহের বড়।

মঞ্জরী। তোমার কথা। আমি বুঝতে পারচি না। তুকি কি বিয়ে করতে রাজি নও ?

সিদ্ধার্থ। যে নারীকে ভালোবাসি তাকে বাঁধতে চাই না, তাকে আমি সাধতে চাই। পূজার বেদী থেকে নামিয়ে বিবাহের যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দিতে আমি নারাজ।

মঞ্জরী। তুমি কী বলচ? তোমার ভালোবাসা কি তাহলে ভান? মিথ্যে তবে?

সিদ্ধার্থ। মিথ্যে হতে দিতে চাই না বলেই ত সেই ভালোবাসাকে গৃহের গণ্ডীর মধ্যে পুরতে রাজি নই।

মঞ্জরী। বুঝেচি। তুমি আমার দেহই চাও। বিলাসের জন্যই।

সিদ্ধার্থ। তাই যদি চাইতুম তবে ত বিয়েই করতুম, কেননা বিবাহই সেই লাইসেন্স দেয়। কিন্তু তা আমি চাই না। তোমার দেহের উত্তাপ নয়, তোমার প্রাণের যে তাপ—তারই স্পর্শ আমার কাম্য।

মঞ্জরী। তুমি কি বলতে চাও আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনদিন দেহসম্পর্ক ঘটবে না?

সিদ্ধার্থ। তা আজ কেমন করে বলব? তবে এইটুকু বলতে পারি তা মুখ্যও নয়, লক্ষ্যও নয়। বন্ধুত্বটাই আসল, দেহ-সম্পর্ক ঘটবে কি ঘটবে না তা একান্তই গৌণ ব্যাপার। হয়ত ঘটবে, হয়ত ঘটবে না,—কোথাও কিছু বাধাও নেই, বাধ্যতাও নেই। যদি ঘটে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে; যদি না ঘটে তাও কিছু অস্বাভাবিক হবে না।

মঞ্জরী। তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না। কিন্তু বুঝবার দরকারও করে না। যখন এর পরিণামে বিবাহ নেই তখন আমাদের এসব আলোচনার কোনো মানে হয়না। তোমার আমার এসব আলোচনাও এখন অন্যায়। তোমাকে অনুরোধ, তুমি আর এসব কথা তুলো না।

সিদ্ধার্থ। বেশ। কিন্তু একটি কথা আমার জিজ্ঞেসার আছে। তুমি কি ইস্তফা দিয়েচ?

মঞ্জরী। না। কিন্তু মনে রেখো, এর পর থেকে তুমি রোগী, আর আমি নার্স।

সিদ্ধার্থ। বেশ তাই। কিন্তু আমার এই দুঃখ থাকল, সমাজের শেখানো বুলিই তুমি বলে গেলে, তোমার নিজের কথা তুমি বললে না। হয়ত তোমার নিজের কথা তুমি জানো না, হয় ত বা জানতে চাও না, কিংবা জানলেও বলতে চাও না। কিন্তু—

মঞ্জরী। কোনো কিন্তু নেই। আমার মনের কথাই তোমাকে বলেচি।

সিদ্ধার্থ। বন্ধু, এ তোমার মনের কথা নয়। কিন্তু, তুমি যা চাও তাই হবে। তবু জেন, তোমার মনের কথাটি শোনবার প্রতীক্ষা আমি করব—চিরদিন করব।

মঞ্জরী। ডাক্তারসাহেবের আবার সময় হোলো, আমি যাই।

[মঞ্জরীর প্রস্থান। সিদ্ধার্থ অত্যন্ত বিমর্ষমুখে শয্যা আশ্রয় করিল। সোমেশের প্রবেশ]

সোমেশ। প্লাকার্ড-ওয়ালা কি বল্‌লে জানো?

[সিদ্ধার্থ চুপ করিয়া রহিল, কোনো উৎসাহ প্রকাশ করিল না।]

সোমেশ। বল্‌লে, লেখকের নাম ছাপতে গেছে ছাপাখানায়। সেই প্লাকার্ড পড়বে কাল।

সিদ্ধার্থ। আমি বড্ড ক্লান্ত ভাই।

সোমেশ। আঃ, আমার যা আনন্দ হচ্ছে! যশ, নাম, অর্থ! আচ্ছা ওরা যে রয়্যাল্‌টি দেবে, কতো টাকা দেবে আন্দাজ করো? একটা রাতের সমস্ত বিক্রিটা, তাই না? আচ্ছা সে কতো টাকা? এক হাজার? না, দু হাজার? ...তিন হাজার বোধহয়? পাঁচ হাজারও হতে পারে, কি বল? অন্তত হাজার তিনেক ত বটেই।

সিদ্ধার্থ। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

সোমেশ। আমার ভবিষ্যৎ আসন্ন আর এখন তোমার ঘুম পাচ্ছে? অধিকারীর আসবার সময় হয়ে এলো। দুপুরের আর তো দেরি নেই বেশি। পুণ্য বলে গেছে তার আগেই আসবেন। তিন হাজার টাকা চেকে দেবেন নিশ্চয়ই, যদি ক্রস্ চেক্ ত্যান্?

সিদ্ধার্থ। আমার কিচ্ছু ভালো লাগচে না। সত্যি, বড়ো ঘুম পাচ্ছে। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, নিজের ভবিষ্যতের অন্ধকারটা কাটিয়ে উঠি, তারপর তোমার ভবিষ্যতের আলোয় যোগ দেব।

সোমেশ। কি হোলো তোমার? শরীর খারাপ? নাকি?

[সিদ্ধার্থ আর কথা বলিল না। কিছুক্ষণের নীরবতা।
মাথায় নতুন ব্যাণ্ডেজ, জিগার প্রবেশ]

এই যে জিগা, এসো এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমার বিছানায়—বোসো এইখানে—।

জিগা। কি কথা বাবু?

সোমেশ। জিজ্ঞেস করচি এই যে তুমি যদি এক থোকে তিন হাজার টাকা পাও তাহলে তুমি কি কর?

জিগা। কি করি? না ভেবে বলতে পারি না বাবু। চাঁদনির বাজারে গিয়ে যা আমার আর আমিনার আর সুমরির চোখে লাগে সব কিনে ফেলি। একটা ব্যবসা করবারও মৎলব আছে। কোকেনের ব্যবসা। চোরাই কারবার, কিন্তু খুব ভাল কাজ বাবু।

সোমেশ। আর, টাকার সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার নাম সারা কলকাতায়—সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে? আজ তো তোমার নাম কেউ জানে না, কাল যদি দেশের

সমস্ত লোক তোমার নামে বাহ্‌বা দিতে থাকে—ধন্য ধন্য করে—তাহলে কি হয় বল ত ?

জিগা। তাহলে ? (ভাবিয়া) তাহলে বোধহয় মরে যাব বাবু।

সোমেশ। ঠিক বলেচ জিগা। এত আনন্দ হবে যে সে আনন্দে মরে যাবার কথাই বটে। আমি সেই কথাই ভাবচি।

জিগা। আমিও একটা কথা ভাবচি বাবু।

সোমেশ। তুমি আবার কি ভাবচ জিগা ?

জিগা। ভাবচি এই যে, গোরারা আমাদের মারলে কেন ? আমরাও কয়েদী, তারাও কয়েদী। ওরাও তো কেল্লায় কয়েদ থাকে, ছাড়া পায় না ; ওদের আবার বড়লোকের নিমকের জন্য জান্‌ দিতেও হয়। আমাদের খালি গতর, ওদের জান্‌ পর্যন্ত কবুল। আমরা ছাড়া পেলে ওদের কী ? ওদের কি ক্ষতি ? যদি ক্ষতি কিছু হয় ত বড় লোকের। ওরা কয়েদী হয়ে কয়েদীকে মারলে কেন বাবু ?

সোমেশ। কেমন করে বলব ভাই।

জিগা। ভাই হয়ে ভাইকে মারলে ? এই কথাই আমি ভাবচি। আপনাদের রামরাজত্বেও কি এই রকম ছিল ? না, আজকালই খালি এই রকম ?

সোমেশ। রাম-রাজত্বের কথা তো জানিনে ভাই।

জিগা। খোদার রাজত্ব আবার দুনিয়ায় আনা যায়

বাবু, আবার আনা যায়। আমি একটা আন্দাজ করেছি।

সোমেশ। কি আন্দাজ করেচ জিগা?

জিগা। খোদার রাজ্য বা রামরাজত্ব যাই বলুন! সেই রাজত্বে বড়লোক থাকবে না আর পুলিস থাকবে না। ওদের জন্যই আমাদের যতো দুঃখ বাবু, ওদের জন্যই আমাদের কষ্ট।

সোমেশ। বড়লোক না হয় নাই থাকবে, কিন্তু পুলিস কি দোষ করলে জিগা?

জিগা। পুলিস থাকলেই জেলখানা থাকবে। আর জেলখানা থাকলে—মানুষ যদি কয়েদ থাকে—কয়েদী থাকলেই আবার সেই গোলমাল, সেই সব। আর পুলিসকে বখরা দিতে দিতেই আমাদের সব চলে যায় বাবু। আমরা সব চোর যদি ধর্মঘট করে চুরি করা ছেড়ে দিই, দেখবেন বাবু, তার পরদিনই পুলিসরা সব কাজ ছেড়ে দেবে।

সোমেশ। (হাসিয়া) তোমার রাম-রাজত্বে আর কি কি থাকবে না শুনি?

জিগা। আর সবই থাকবে। কেবল থাকবে না বড়লোক আর পুলিস। সকলকে চাষ বাস করে খেতে হবে, কেউ টাকা জমিয়ে কি মুনাফা লুটে আর সব ভাইকে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে বড়লোক হতে পারবে না।

সোমেশ। কিন্তু এত বড় রাজ্য চালাতে হবে তো?

কথায় বলে রাজ্য শাসন : কত শক্ত কাজ—তার কি ব্যবস্থা করেচ জিগা ?

জিগা। রাজ্য শাসন করবে চোরে।

সোমেশ। চোরে!

জিগা। তাইত করবে বাবু। প্রত্যেক গাঁয়ে দুটো করে চোর থাকবে। তারা দেখবে কেউ যাতে টাকা না জমায়। লোকে যদি দিন আনে আর দিন খেয়ে উড়িয়ে দ্যায় তাহলে আর তার চোরের ভয় কি বাবু? কিন্তু তার মধ্যে কেউ যদি লুকিয়ে টাকা করে, দেখবেন বাবু, চোরের ঠিক টনক নড়েছে। চোর তার পুঁজি হালকা করে দেবে বাবু, আবার তাকে সবার সমান করে দেবে।

সোমেশ। চোর নাহয় বুঝলাম, কিন্তু দুটো চোর কেন ?

জিগা। একটা আরেকটার ওপর নজর রাখবার জন্যেই। এক ব্যাটা চুরি করে বড়লোক হবার ফিকিরে আছে কিনা আরেক ব্যাটা সেটা দেখবে। চুরি করে উড়িয়ে দাও, বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু যদি তুমি টাকা জমিয়ে ফেঁপে ওঠার তালে থাকো তাহলে অন্য চোরটা তখন তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে চুপ্‌সে দেবে। চোর ছাড়া কি চোরকে কেউ ধরতে পারে বাবু, চোরের উপর বাটপাড়ি করতে পারে কখনো ?

সোমেশ। তোমার প্ল্যান্‌টা একেবারে ফ্যালনা নয়। মনে হচ্ছে, চোরের রাজত্বে আমরা সুখেই থাকব।

কিন্তু একটা অসুবিধা আছে, এখন যারা বড়লোক হয়ে অনেক টাকা কামিয়ে ফেলেছে তারা নিজেদের পুঁজি কমিয়ে ফেলতে রাজি হবে কি ? তারা সবার সমান হতে চাইবে কেন ?

জিগা। তাদের টাকা কড়ি সব কেড়ে নেব। কেড়ে নিয়ে সব ভাইয়ের ভিতর সমান ভাগে বাটোয়ারা করে দেব। বড়লোকও একটা ভাগ পাবে ; তার হক্কের টাকা মারা যাবে না। কারো পাওনা আমরা মারবো না বাবু।

সোমেশ। টাকা কড়ি নাহয় ভাগ করে দিলে, কিন্তু ধনরত্ন, হীরে-জহরৎ, মণিমুক্তা—ওসবের তো চুলচেরা ভাগ হয় না। তখনই তো মুস্কিল বাধবে। সেগুলো কে পাবে, কোথায় যাবে বল তো ?

জিগা (হাতের ভঙ্গী করিয়া ভাঙা ইংরেজিতে গম্ভীর ভাবে)। সেসব ? টু—মাই—ওয়াইফ্ !

সোমেশ। সিদ্ধার্থ বলেছিল মিথ্যে না। রাজ্য চালাবার মাথা তোমার আছে। দেশের নেতাও তুমি হতে পারতে !

জিগা। (সিদ্ধার্থকে দেখাইয়া)। ও বাবু এমন অবেলায় ঘুমোচ্ছেন কেন ? ওঁর কি ভবিষ্যৎ আচ্ছা নেই ?

সোমেশ। তাই মনে হচ্ছে। ওঁকে জাগিয়ো না।

[কুলী প্রবেশ করিয়া সোমেশের হাতে একটা চিরকুট দিল।]

কুলী। একজন ভদ্দর আদ্‌মি এসেছে।

সোমেশ। আসতে বল, বাবুকে আসতে বল। জিগা, যাও। তোমার নিজের খাটে যাও।

[কুলীর প্রস্থান। সোমেশ বিছানাটা গোছাইয়া নিজেকে বিন্যস্ত করিয়া লইল। ভূজঙ্গম অধিকারীর প্রবেশ।]

সোমেশ। আসুন। আসুন অধিকারীমশাই ! আমার কি ভাগ্য ! আপনি আমার কাছে এখানে আসবেন আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি।

ভূজঙ্গম। হঁ্যা। বিশেষ প্রয়োজনে আসতে হোল। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সোমেশ। তখনই আপনাকে বলেছিলুম তো নতুন লেখকের লেখা লোকে নেবে। লোকে নতুন জিনিসই চায়। দেখলেন ত ?

ভূজঙ্গম। তোমার লেখা বই, আর যে-বই অভিনয় হচ্ছে তার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তোমার লেখার কিছুই নেই তাতে—কেবল তোমার দেয়া নামটি ছাড়া। আমাদের বিহঙ্গম—আমার মাস্তুত ভাই বিহঙ্গমকে জানো তো ? সেই তোমার প্লটের ওপর কাঁচি চালিয়ে আর জোড়াতালি মেরে আনকোরা নতুন নাটক খাড়া করেচে। অবশ্যি বিহঙ্গম যা করেচে সব আমারই

নির্দেশমত। আমিই বলতে গেলে তোমার বইয়ের যাকে বলে গড ফাদার, তাই !

সোমেশ। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার বইকে অভিনয়ের যোগ্য করতে আপনি যে কষ্ট স্বীকার করেচেন তার ঋণ আমি কোনদিন শুধতে পারব না। আপনার অভিনয়ের সুবিধার জন্য যা যা করেচেন তার ওপর আমার কথা নেই, কিন্তু বইটার যে এক আধটু অদল-বদল হয়েচে সে বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে। পুণ্যবলছিল—

ভুজঙ্গম। এক আধটু অদল বদল? খোল নলচে—একেবারে খোল নলচে বদলে ফেলা হয়েচে।

সোমেশ। কই, পুণ্য তো সেকথা আমাকে বলে নি। সে প্রথম রাত্রেও গেছল। সে বলছিল আপনি প্রথম ও চতুর্থ অঙ্ক হুবহু ঠিক রেখেচেন, কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক কয়েকটি দৃশ্যে ভাগ করে দিয়েচেন। কিন্তু সেজন্য আমার আপত্তি না;—আমার আপত্তি এই, চতুর্থ অঙ্কের শেষে আমার নায়ককে আপনি অকারণে হত্যা করেচেন।

ভুজঙ্গম। অভিনয় জমাবার জন্যই করতে হোল। ডাইং স্পীচ একটা না থাকলে হাততালি পড়ে না।

সোমেশ। আপনি ডাইং স্পীচের জন্যে আমার নায়ককে খুন্ করলেন? আমি সারা পৃথিবীর জন্যও পারতুম না।

ভুজঙ্গম। আমি অভিনয় কি প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে তোমার কাছে শিক্ষা নিতে আসিনি, তর্ক করতেও নয়। সমস্ত কাগজে আমার নাটনৈপুণ্যের প্রশংসা বেরিয়েচে।

সোমেশ। আপনি রাগ করচেন কেন? আপনি যা করেছেন তার ওপরে তো আমার কথা নেই। আমার বই যে আপনি নামিয়েছেন তাতেই আমি কৃতজ্ঞ। চিরকৃতজ্ঞ। তবে আমার বই যখন আমি বের করব তখন গোড়ায় আমার যেমন ছিল তেমনটিই ছাপতে দেব।

ভুজঙ্গম। বই আমরা ছাপতে দিইচি। যেমনটি অভিনয় হয়েচে ঠিক তেমনটিই ছেপে বেরুবে।

সোমেশ। সর্বনাশ! আমার সর্বনাশ করেচেন! আমাকে না জানিয়ে কেন এমনটা করলেন?

ভুজঙ্গম। তোমাকে জানিয়ে? তার মানে?

সোমেশ। আমার বই তো।

ভুজঙ্গম। তোমার বই? স্বপ্ন দেখচ? বলেচি না, কেবল বইয়ের নামটাই তোমারি। 'ভবিষ্যৎ'—এই নামটা।

সোমেশ। আমার বই নয়?

ভুজঙ্গম। তোমার বই—একথা—একথা একেবারে ভুলে যাও।

সোমেশ। তাহলে আমি রয়্যালটিও পাবো না?

ভুজঙ্গম। রয়্যালটি! হাঃ হাঃ হাঃ! লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ছাড়া রয়্যালটি আমরা কারুকে দিইনে।

সোমেশ। তবে—তবে কিজন্য আমার কাছে এসেচেন ?

ভুজঙ্গম। বইখানা আমার লেখা, সব কাগজের সম্পাদককে এই কথা বলেচি। বইখানা আমার নামেই বেরুচ্ছে। আমার নামে প্লাকার্ডও ছাপতে গেছে, কাল বাজারে পড়বে।

[সোমেশ বাক্যহারা বিবর্ণমুখে নিষ্পলক চাহিয়া রহিল।]

ভুজঙ্গম। এখন, তোমার সঙ্গে আমার কথাটা হচ্চে এই—ভবিষ্যৎ যে তোমার, একথা ভুলে যেতে হবে। ভবিষ্যৎ আমার। আমারই ভবিষ্যৎ—আমার ? বুঝলে ?

সোমেশ। (হতবোধের মত)। ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ—

ভুজঙ্গম। এজন্য অবশ্যি তুমি টাকা পাবে।

সোমেশ। (সেই ভাবে)। টাকা—টাকা !

ভুজঙ্গম। হ্যা, টাকা পাবে।

[মনিব্যাগ খুলিয়া নোটের কেতা বাহির করিল
গুনিয়া দেখিল বারোখানি দশ টাকার নোট—
দুখানি ব্যাগে রাখিয়া দিল।]

ভুজঙ্গম। এর জন্য পঞ্চাশ টাকাই তোমার পাওনা হওয়া উচিত ছিল। তা, তোমাকে আমি একশ টাকাই দিলুম।......এই নাও !

[সোমেশ সেই ভাবে বসিয়া রহিল, নড়িল না।]

ভুজঙ্গম। যাক্‌গে, এ দুখানাও নাও—সবই দিয়ে দিলুম। পুরো একশ কুড়ি টাকাই হোলো তোমার। বড়ো কম টাকা নয়। আচ্ছা, এই ব্যাগেই থাক। ব্যাগটাও তোমাকে দিলুম, দামী ব্যাগ্‌।—আমার উপহার !

[উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ভুজঙ্গম। আমি চল্লুম। এক্ষুণি আমাকে রিহার্সালে বসতে হবে। ভালো হয়ে একদিন থিয়েটারে যেয়ো, দেখে এসো—একখানা ফ্রি পাশ দেব তোমায়। পয়সা লাগবে না।

[প্রস্থান।]

[সোমেশ কিছুক্ষণ সেই ভাবে স্তম্ভিত থাকিয়া সহসা বিছানায় লুটাইয়া পড়িল; মনে হইল, যেন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মনিব্যাগটা তাহার নিচে চাপা পড়িয়া গেল। জিগা উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু দরজা দিয়া দূরে কাহাদের আসিতে দেখিয়া বিছানায় শুইয়া ঘুমের ভান করিল।
ডাক্তার সাহেব, ডাক্তারবাবু,
নার্স ও কুলীর প্রবেশ]

ডাক্তার সাহেব। (সোমেশের রিপোর্টশিট্‌ পড়িয়া দেখিয়া) দুধ্‌-রোটি।

[তাহার পরে সিদ্ধার্থর রিপোর্টশিট্ পড়িয়া দেখিয়া]

দুধ্-রোটি।

[জিগার রিপোর্টশিট্ পড়িয়া দেখিয়া]

দুধ্-রোটি।

[সোমেশ বেকায়দায় শুইয়াছিল, তাহাকে ভালোভাবে শোয়াইতে গিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়াই কুলী চমকাইয়া উঠিল। ডাক্তার সাহেব যে-সময়ে বৃদ্ধ রোগিটির রিপোর্টশিট্ দেখিতে ছিলেন সেই সময়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল]

কুলী। সাব্, এ যে মর্ গিয়া।

ডাক্তার সাহেব। (রিপোর্টশিট্ পড়িতে পড়িতেই) ফেক্ দেও।......দুধ্-রোটি।

[ডাক্তার সাহেব পাশের ঘরে গেলেন, নার্স ও কুলীও গেল। ডাক্তার বাবু সোমেশের বুক ও নাড়ী দেখিলেন—পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেই পুণ্য প্রবেশ করিল।]

পুণ্য। ডাক্তারবাবু, সোমেশকে নিয়ে যেতে এসেচি। কেন, এমন অসময়ে ও ঘুমোচ্চে কেন ?

ডাক্তার। যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটেছে পুণ্য-বাবু! আপনার বন্ধুর হার্টফেল হয়েচে।

[পুণ্য বিমূঢ় হইয়া গেল। কিছুক্ষণের নীরবতা]

পুণ্য। হার্টফেল্! কেন এমনটা হোলো ডাক্তার বাবু? ভুজঙ্গম্ বাবু এসেছিলেন বুঝি ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, খানিক আগে ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে গেছেন।

পুণ্য। আনন্দের আঘাত সহ্য করতে পারেনি বেচারা!

ডাক্তার। আপনার বন্ধুকে নিয়ে যেতে এসেচেন? নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন এবার।

পুণ্য। এমনটা ঘটবে আমি ভাবিনি।

ডাক্তার। আপনার বন্ধুর লেখা পড়িনি আমি যদিও—মানে, সুযোগ পাইনি পড়বার। তাহলেও ওঁর লেখার প্রশংসা আমি শুনেচি। এত অল্প বয়সে মারা গেলেন, বেঁচে থাকলে সাহিত্যে অনেক-কিছু দিতে পারতেন। আহা, বড় ভালো ছেলে ছিল সোমেশ। যাক্ এখন আপনার বন্ধুকে নিয়ে যান্।

পুণ্য। যাই, তার ব্যবস্থা করিগে। [প্রস্থান।]

ডাক্তার। কুলী! [কুলীর প্রবেশ।]

যা, বুড়োবাবুকে ষ্ট্রেচারে করে' ড্রেসিং রুমে নিয়ে যা। সাহেবের সামনে ওঁর চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে।

[কুলীর প্রস্থান ও ক্ষণপরেই ষ্ট্রেচার লইয়া প্রবেশ।]

কুলী। (বৃদ্ধের গায়ে হাত দিয়া) বাবু উঠুন।

বৃদ্ধ। (চমকিয়া জাগিয়া উঠিল) কে?

ডাক্তার। আমি—আমি ডাক্তার।

বৃদ্ধ। ডাক্তারবাবু? আপনি? এখন রাত কত ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। রাত? রাত আর নেই, ভোর হয়ে এসেচে।

বৃদ্ধ। আঃ! বাঁচলেম! সারা রাত কী দুঃস্বপ্নই না দেখেচি। মনে হোলো যেন বাড়িতে আগুন লেগেচে। চারিদিকে গোলমাল—চীৎকার—আর্তনাদ। কেউ আগুন নেভাতে পারচে না। দমকলগুলো কেবল ছুটোছুটি করচে—আর অনবরত ঢং ঢং ঢং ঢং! দমকলের ঘণ্টা বাজচে। আর আমি সেই আগুনের মধ্যে। চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছি—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু কে যেন আমার গলা চেপে ধরচে, আমার কথা বেরুচ্চে না। উঃ! কী ভয়ঙ্কর—কী ভয়ঙ্কর রাত!

ডাক্তার। আর কোনো ভয় নেই আপনার। সকাল হয়ে এসেচে। এইবার আপনি একবার এই ষ্ট্রেচারে

উঠুন। ডাক্তার সাহেব আপনার চোখের বাঁধন খুলে দেবেন। আপনি আবার দেখতে পাবেন। সূর্য উঠচে—সূর্যের আলো দেখতে পাবেন।

বৃদ্ধ। সূয্যি উঠচে? সূয্যি? আঃ, কতোদিন দেখিনি! ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান। আমি বাঁচতে চাই।

ডাক্তার। ভয় কি আপনার? আমি তো আপনার কাছেই আছি।

বৃদ্ধ। আপনি দীর্ঘজীবী হোন ডাক্তারবাবু, আমার পরমায়ু আপনার হোক।

[বৃদ্ধকে ষ্ট্রেচারে লইয়া ডাক্তার ও কুলির প্রস্থান।
জিগা উঠিল—চারিদিকে ভালো করিয়া চাহিয়া
দেখিল। সোমেশের কাছে গিয়া তলায়
চাপা-পড়া মনিব্যাগটি হাতাইল। শেষে
জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া
গলা বাড়াইয়া বাহিরের দেয়াল
ও নীচেটা ভালো করিয়া
লক্ষ্য করিল।]

জিগা। নর্দামার এই নল বেয়ে সোজা নেমে যাওয়া যাবে—কেউ দেখতে পাবে না।

[জানালা-পথে তাহার অন্তর্ধান।]

য ব নি কা

এই লেখকের

প্রবন্ধের বই

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি	২৲

গল্পউপন্যাস

মেয়েদের মন	২॥০
প্রেমের বি-চিত্র গতি	৩৲
মেয়েধরা ফাঁদ	২॥০
দেবতার জন্ম	৩৲
প্রেমের প্রথম ভাগ	২॥০
প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ	২॥০
অথ বিবাহঘটিত	২৲
পাত্র-পাত্রী সংবাদ	৩৲

লেখসঞ্চয়

আমার লেখা	৪॥০

ছোটদের বই

বাড়ি থেকে পালিয়ে	২৲
বিনির কাণ্ডকারখানা	১।০
বন্ধু চেনা বিষম দায়	১॥০
ভূত ও অদ্ভুত	১॥০
আত্মীয়তা বজায় রাখা সহজ নয়	১।০
শিব্রাম্ চকর্‌বর্‌তির মতো কথা বলায় বিপদ	১।০